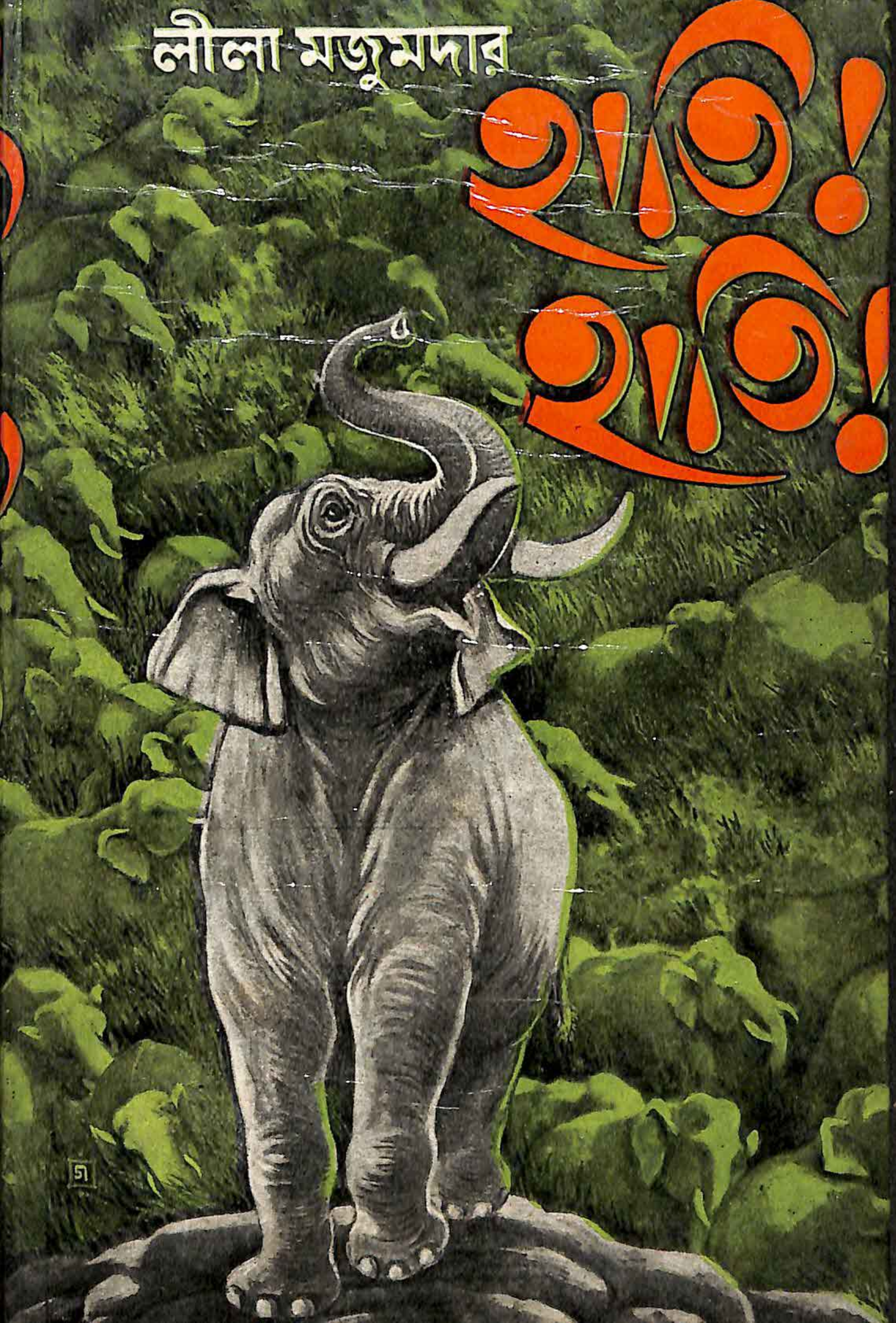
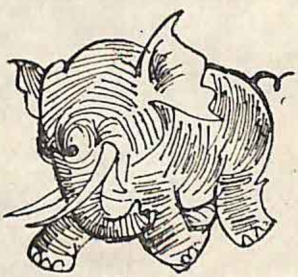

লীলা মজুমদার
হাতি! হাতি!

রবীন্দ্র পুরস্কার ও ভারত সরকারের শিশু-সাহিত্য
পুরস্কার প্রাপ্তা

লীলা মজুমদার

হাতি! হাতি!



বিমলারঞ্জন প্রকাশন
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম মুদ্রণ :
শুভ জন্মাষ্টমী
ভাদ্র, ১৩৮৪ সাল

দ্বিতীয় মুদ্রণ :
শুভ জন্মাষ্টমী
২৬শে শ্রাবণ, ১৩৮৯

প্রকাশক :
শ্রীবিমলারঞ্জন চন্দ্র
বিমলারঞ্জন প্রকাশন
৮।১সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ অলংকরণ :
গণেশ বসু

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

শান্তিনিকেতনের যে-সব ছেলে-মেয়েদের গল্প বলে বলেও সাধ মেটাতে পারিনি, এ-বই তাদের দিলাম।

হাতি! হাতি!

ভূমিকা

এই ছোট বইটির বেশির ভাগ গল্পই সন্দেশে গল্প-সল্প নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় সব গল্পই সত্যি ঘটনা অবলম্বন করে লেখা। কতক যারা ঘটনাস্থলে ছিল তাদের কাছে শোনা, কতক খবরের কাগজে কিংবা সত্যিকার জীবন-কথা থেকে নেওয়া। দু'টি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, কিংবা শোনা কথা। কোনটাই নিছক্ মন-গড়া নয়।

শুধু কিশোর-কিশোরীরা নয়, এই বই পড়ে আট-দশ বছরের ছেলে-মেয়েরাও আনন্দ পাবে, আমার মনে এই আশা। আর শুধু আনন্দ নয়, হাতির মতো মহান্ সুন্দর জানোয়ারকে কেউ যদি এ বই পড়ে বুঝতে শেখে, তা হলে আমি কৃতার্থ হব। ইতি—

লীলা মজুমদার



হাতি ! হাতি !

কিশোর-কিশোরীদের জন্য কয়েকখানি নতুন বই :

হাতি চড়া

ছোটবেলা থেকেই হাতির গল্প শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেছিল। তোমরা নিশ্চয়ই জান সেকালে পৃথিবীর অনেক জায়গায় যে প্রকাণ্ড লোমওয়ালা হাতি ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। মাটি খুঁড়ে পাথর হয়ে যাওয়া হাতির হাড়, এমন কি হাজার বছর ধরে বরফের নিচে চাপা-পড়া হাতির দেহ পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

তবে আজকাল মাত্র তিনটি দেশে হাতি দেখা যায়। সে তিনটি জায়গা হল : আফ্রিকা মহাদেশ, ভারত আর বর্মা। অবশ্য এই সব জায়গা থেকে অন্য দেশেও হাতি চালান যায়।

সেকালে আমাদের এই বাংলায় বড়লোকদের বাড়িতে হাতি বাঁধা থাকত। আজকাল যেমন মোটরে করে লোকে এখানে-ওখানে যায়, সে সময়ে তেমনি হাতি চেপে যেত।

সে হাতির কম যত্ন করতে হত না। তার জন্য মাহুত রাখতে হত। মাহুতরা শুধু হাতি চালাত না, হাতির উপর সব সময় চোখ রাখতে হত, কারণ হাতির মেজাজ বিগড়ে গেলেই তো সর্বনাশ! মানুষ মাড়িয়ে, বাড়িঘর ভেঙে, ক্ষেত নষ্ট করে, সে এমন বিষম কাণ্ড বাধাত যে লোকজন পালাবার পথ পেত না।

তবে যারা হাতি দেখার কাজ জানত, হাতি তাদের কথামতো চলতো। ভালোবাসা পেলে হাতিও উল্টে খুব ভালোবাসত।

আমাদের পূর্বপুরুষরা পূর্ব-বাংলার ময়মনসিংহ জেলায় থাকতেন। ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে ভারি সুন্দর জায়গা। বড় বড় আম-কাঁঠালের বন, মস্ত সব পুকুর, সবুজ ধানের ক্ষেত। তবে ভালো বাঁধানো রাস্তা তখন কম-ই ছিল। মোটর-গাড়িও ছিল না; লোকে অসমান রাস্তা দিয়ে গোরুর গাড়িতে, কিংবা ঘোড়া বা হাতি চেপে যাওয়া-আসা করত।

একবার আমাদের মসূয়া-গ্রামের পাশের গ্রামে একটা বিয়ে বাড়িতে সকলের নেমন্তন্ন হল।

ঠিক হল যে, সকলের যাবার সুবিধে হবে না, খালি চোদ্দ-পনেরো বছরের দুজন ছেলে যাবে। তাঁদের একজনের নাম কুলদারঞ্জন, আমার ছোট জ্যাঠামশাই, অন্যজন তাঁদের আত্মীয় ভগবানদাদা।

সেকালের নেমন্তন্ন মানে দুপুরে খাওয়া, তাও খেতে খেতে বেলা চারটে বেজে যেত। সন্ধ্যার আগেই ব্যাপার চুকে যেত, নইলে বিজলি বাতি, গ্যাস বাতি, কিছুই ছিল না, সকলের ভারি অসুবিধা হবে।

সে যাই হোক, ছোট জ্যাঠামশাই আর ভগবানদাদা যাবেন বলে মাহুতসুদ্ধ একটা হাতির বন্দোবস্ত হল।

বেলা দশটার মধ্যে হাতি এসে দোরগোড়ায় দাঁড়াল, জ্যাঠা-মশাইরা ভাতে-ভাত খেয়ে তৈরি। তখনো পাড়াগাঁয়ে কেউ চা, পাঁউরুটি খেতে শেখেনি।

ভারি ভালো মানুষের মতো চেহারা হাতিটার। মাহুত একটা শব্দ করতেই সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল আর জ্যাঠামশাইরা সহজেই তার পিঠে উঠে পড়লেন।

হাওদা-টাওদার বালাই ছিল না; বেটা-ছেলে দুজন যাবে, হাওদা দরকার-ই বা কি? শুধু একটা গদীমতো জিনিস হাতির পিঠের ওপর এঁটে বাঁধা ছিল।



মাহুত বসল হাতির ঘাড়ের ওপর, খালি পিঠে। তার পিছনে ছোট জ্যাঠামশাই আর সবার পিছনে ভগবানদাদা। তাঁর পিছন থেকেই হাতির পিঠটা ঢালু হয়ে ল্যাজের দিকে নেমে গেছিল, কারণ হাতিটা খুব বেশি বড় ছিল না। তাই বলে খুব ছোটও ছিল না।

মহা ফূর্তি করে জ্যাঠামশাইরা নেমন্তন্ন খেতে রওনা হলেন।

দেখতে দেখতে মন্থুয়া-গ্রাম পিছনে পড়ে রইল। একটা বাঁক ঘুরতেই, ঘরবাড়িগুলোও চোখের আড়াল হয়ে গেল। তখন ওঁরা এমন জায়গায় এসে পড়েছেন যে দু-পাশে দুটি ধান-ক্ষেত, মধ্যিখানে রাস্তা। অল্প অল্প বাতাস বইছে, ধান-ক্ষেতে ঠিক যেন সবুজ ঢেউ উঠছে।

এমন সময়ে মাহুত বলল, "দেখ, খোকাবাবুরা, তোমরা তো দিব্যি পেটপুরে খেয়ে এলে, আমি সকাল থেকে কিছু দাঁতে কাটিনি, আবার কখন খাবার জুটবে তাও জানি না। ঐ যে ধান-ক্ষেতের ওপাশে আমবাগান দেখছ, তার পিছনে আমার বাড়ি। আমি সেখানে গিয়ে চাট্টি রান্না ভাত খেয়ে আসি। তোমরা হাতির পিঠে বসে থাক।"

জ্যাঠামশাইরা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "হাতি কিছু বলবে না তো?" মাহুত খুব হাসল "বলবে আবার কি? ও-ও তো পেট ভরে খেয়ে এসেছে। তা-ছাড়া ও ভারি ভালো মেয়ে, ওর নাম লক্ষ্মী!"

এই বলে হাতির কানে পা দিয়ে, সুড়ুৎ করে মাহুত ঐ অতখানি উঁচু থেকে নেমে পড়ল। যাবার সময় জ্যাঠামশাইকে বলে গেল, "কি আর করবে হাতি, বড় জোর রাস্তা থেকে ধান-ক্ষেতে নেমে যাবে, কচি কচি ধানসুদ্ধ ধানগাছ ছিঁড়ে খাবে। সেটি কিন্তু করতে দিও না। ঐ যে তোমার হাতের কাছে বাঁকা লাঠিটা আছে, ওকে বলে অঙ্কুশ, ঐটে দিয়ে কানে টান দিও।"

মাহুত ধান-ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে, আমবাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ল, আর তাকে দেখা গেল না।

হাতিটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু একটু দুলতে লাগল।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল; হাতিটা মাঝে মাঝে অল্প অল্প কান ঝাড়া দিতে লাগল।

তারপর আরো আধ ঘণ্টা কাটলে পর, ধীরে সুস্থে হাতি ধান-ক্ষেতে নেমে, গোছা গোছা ধানগাছ ছিঁড়ে মুখে পুরতে লাগল।

তাই দেখে জ্যাঠামশাইদের চক্ষু চড়ক-গাছ! মালিক দেখতে পেলে তো আস্ত রাখবে না।

কি আর করা, জ্যাঠামশাই গিয়ে মাহুতের খালি জায়গায় বসে, পা দিয়ে হাতির কানে খোঁচা দিয়ে বললেন, "এই লক্ষ্মী, ও কি হচ্ছে! রাস্তায় ওঠ বলছি।"

লক্ষ্মী গ্রাহ্যই করল না, বরং আরো কয়েক পা এগিয়ে ধান-ক্ষেতের আরো ভিতরে ঢুকল। অনেকগুলো গাছ চ্যাপটা হয়ে গেল।

তারপর রাস্তার ওপর কতকগুলো গাঁয়ের লোক জড়ো হয়ে বকাবকি শুরু করল।

"হাতি সরাও বলছি, নইলে ভালো হবে না।"

কি আর করেন, জ্যাঠামশাই অঙ্কুশটা দিয়ে হাতির কানে একটা হ্যাঁচকা টান মারলেন। ভগবানদাদা অঙ্কুশটা কেড়ে নিলেন।

আর যায় কোথায়! শুঁড় উঁচিয়ে, চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে, শত শত ধানগাছ মাড়িয়ে, হাতি দৌড়ে গিয়ে আমবাগানের ধারে গিয়ে উঠল তারপর সোজা বাগানের দিকে ছুট। কি সর্বনাশ! ওর মতলব ছিল নিচু ডালের তলা দিয়ে যাবে আর পিঠের ঐ আপদ দুটো আচ্ছা জব্দ হবে। জ্যাঠামশাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, "ও ভগবানদাদা, অঙ্কুশটা দাও বলছি।"

মাটি থেকে ভগবানদাদা বললেন, "আমি লাইম্মা পড়সি। অঙ্কুশ কোথায় পইড়া গেসে!"

জ্যাঠামশাই তক্ষুণি বুঝে নিলেন যে লাইম্মা পড়েছেন না আরো

কিছু! স্রেফ হাতির ল্যাজের ওপর দিয়ে পিছ্‌লে পড়ে গেছেন।

কিন্তু এখন উপায়টা কি হবে? হাতি তো আম-বাগানে পৌঁছে গেল!!

উপায়টা খুবই সহজ।

আমবাগানের পাশের একটা খড়ের চালের ঘর থেকে রোগা শুঁটকো মাহুত ছিটকে বেরিয়ে এসে, আঙুল তুলে ধমক দিল, "এই লক্ষ্মী, হতভাগা মেয়ে, দাঁড়া বলছি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ভালোমানুষটির মতো দাঁড়িয়ে পড়ে একটু একটু দুলতে লাগল, যেন কিছুই হয়নি।

মাহুত একটা শব্দ করতেই লক্ষ্মী হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল আর অঙ্কুশ হাতে ভগবানদাদা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে উঠে পড়লেন। মাহুত খচমচ করে হাতির ঘাড়ে চেপে বসে, অঙ্কুশটা হাতে তুলে নিল।

লক্ষ্মী ওঁদের নিয়ে বিয়ে-বাড়ির দিকে চলল।



যাত্রামঙ্গল

বলেছি তো সেকালে অনেক লোকে হাতি পুষত। আমার মেজ জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোরের ময়মনসিংহের বাড়িতে দুটো হাতি ছিল। দুটি একেবারে দুই রকম।

মেয়ে হাতিটার নাম ছিল কুসুমকলি। যেমন মিষ্টি নাম, তেমনি মিষ্টি ছিল তার স্বভাবটিও।

মাহুতের তাকে নিয়ে ভারি গর্ব ছিল। বাড়িতে কেউ এলে, অমনি তাকে অতিথিদের কাছে নিয়ে যেত। কুসুমকলি মাথা নিচু করে, শুঁড় বাড়িয়ে তাঁদের পায়ে বুলিয়ে, পায়ের ধুলো মাথায় নিত। মুখখানিও ছিল বড় মিষ্টি, চোখ দিয়ে মিটি মিটি হাসত।

যাত্রামঙ্গল ছিল ঠিক এর উল্টোটি। দেখতেও যেমন বড়সড়, তেজালো, মেজাজটাও তেমনি কড়া। কখন যে কি করে বসে তার ঠিক-ঠিকানা ছিল না। কাজেই ওকে বাইরের লোকের সামনে আনলে, সবাই সমস্তক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকত।

আসল ব্যাপার হল সবাইকে যাত্রামঙ্গল পছন্দ করত না বিশেষ করে নোংরা কাপড়পরা কেউ কাছে এলে ও হাড়ে চটে যেত।

একবার যাত্রামঙ্গলকে বড় পুকুরে স্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছিল মাহুত। যাত্রামঙ্গল-ও ঠাণ্ডা মেজাজেই চলেছিল, এমন সময় সামনে পড়ল এক বুড়ি।

বুড়ির মাথায় একটা ধামা, ধামায় এক পুঁটলি চাল। বুড়ির কাপড় খুব একটা নোংরা ছিল না, কিন্তু পুঁটলির কাপড়টা ছিল জঘন্য। তাই দেখে যাত্রামঙ্গল হন্ হন্ করে এগিয়ে চলল।



ব্যাপার বুঝে মাহুত তারস্বরে চেঁচিয়ে বুড়িকে সাবধান করে দিতে লাগল।

হট্টগোল শুনে পিছন ফিরে যাত্রামঙ্গলের ঐ চেহারা দেখে বুড়ির তো চক্ষু স্থির! সে ধামা মাথায় নিয়েই প্রাণপণে ছুটতে লাগল। যাত্রামঙ্গল-ও বেগ বাড়াল।

ভাগ্যিস্ রাস্তার ধার থেকে একজন লোক বুড়িকে টেনে হাতির পথ থেকে সরিয়ে দিল, তাই তার কিচ্ছু হল না। ধামাটা মাটিতে পড়ে গেল।

যাত্রামঙ্গল বুড়ির দিকে ফিরেও চাইল না, নিঃশব্দে ধামা থেকে নোংরা পুঁটলিটা শুঁড় দিয়ে তুলে নিয়ে, মাটিতে আছড়ে ফেলল। তারপর পা দিয়ে সেটাকে মাড়িয়ে, থেঁৎলে, মাটিতে প্রায় পুঁতে ফেলে, আবার ভালোমানুষের মতো পুকুরের দিকে চলল।

বুড়িকে বা আর কাউকে কিছু বলবে কেন, তাদের ওপর তো ওর কোনো রাগ ছিল না।

আমি নিজে হাতির ঐ ভালো মানুষ চোহারাই দেখেছি। আমার বাবাকে বনে বনে জরীপের কাজে ঘুরতে হত। তাঁর সঙ্গেও দু-চারটে হাতি থাকত। বাবা তাদের বিষয়ে অনেক গল্প বলতেন।

একবার চেরাপুঞ্জি বলে একটা ছোট শহরের কাছে বাবাদের তাঁবু পড়েছিল, আমরাও চেরাপুঞ্জিতে গিয়েছিলাম।

তখন আমি খুব ছোট, তবু মনে আছে হাতে করে হাতিকে কমলা খেতে দিলে, হাতি শুঁড়ে করে তুলে, কপালে ঠেকিয়ে, মুখে পুরে দিত। একদিন হাতির পিঠে চড়ে খানিকটা বেড়িয়েও এসেছিলাম।

বাবার কাছে শুনতাম যে হাতির ভারি বুদ্ধি আর বেজায় স্মৃতি-শক্তি। কেউ একবার খারাপ ব্যবহার করলে, অনেক দিন মনে রাখে, সুবিধা পেলেই প্রতিশোধ নেয়। আবার ভালোবাসার মানুষদেরও কখনো ভোলে না।

হাতির ছেলে

ইংরেজরা যখন আমাদের দেশে রাজত্ব করত, তখন বর্মার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল।

ভারতের পূব কোণের পাহাড়-বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বর্মা চলে যাওয়া যেত। তাই বলে পথ-ঘাট কিছুই ছিল না। নদী পার হয়ে, ঘন বনের গাছ কেটে, পাহাড় ডিঙ্গিয়ে পথ করে নিতে হত।

ওখানকার লোক ছাড়া ও-দিকে কেউ বড় একটা যেত-ও না। তবে আমার বাবাকে লোক-লস্কর, দা-কুড়ুল, ঘোড়া-বন্দুক, খাবার-দাবার, থাকবার জন্য তাঁবু, বোঝা বইবার জন্য কখনো হাতি, কখনো খচ্চর নিয়ে ঐ সব জায়গায় মাসের পর মাস কাটাতে হত।

বাবা ভারতের জরিপ-বিভাগে কাজ করতেন।

ওঁদের কাজ মানেই হল—নদী-নালা, পাহাড় মাঠ, কোনটা থেকে কোনটা কত দূরে, সেখানে কি গাছে কি ফসল হয়, কেমন লোক থাকে—এই সব দেখেশুনে, মেপে, এঁকে, লিখে নিয়ে আসা। তারপর তাই দেখে জরিপ বিভাগে ম্যাপ্ তৈরি হয়।

ও-সব জায়গায় দূরে দূরে একেকটা গ্রামে কয়েক ঘর লোকের বাস।

তাদের বর্মী বলবে, না ভারতীয় বলবে তাই সব সময় বোঝা যেত না। আর ছিল চারদিকে ঘন বন, বড় বড় ঘাসে ঢাকা খোলা জমি। সেখানে জন্তু-জানোয়ার থিক্‌থিক্ করত।



সাহেবরা মাঝে মাঝে দেশী জমিদারদের সঙ্গে ভাব করে, শিকার করতে যেত।

বাবা মিছিমিছি জানোয়ার মারতে ভালোবাসতেন না। একবার পাহাড়ের একটু নিচের দিকে নতুন জায়গায় তাঁবু ফেলেছেন।

এক সাহেবের সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'এখানে একটা বুনো হাতি আমার লোকজনদের তাড়া করত, তাকে আমি গুলী করে মেরেছি। তোমরা সাবধানে থেক, যদি আরো হাতি থাকে।'

রাতে বাবার লোকেরা এসে বলল, "সাহেব, যেখানে ঐ হাতিটা মরে পড়ে আছে, সেখানে হাতির ভূত বড় গোলমাল করছে। অনেকেই শুনেছে। এখানে কেউ থাকতে চাইছে না।"

সকালে বাবা ব্যাপার কি দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখেন বনের ধারে খাদের মধ্যে মরা হাতির পাশে একটা বাচ্চা হাতি! শুঁড় দিয়ে সে মাকে তুলতে চেষ্টা করছে আর বেজায় চেঁচাচ্ছে। বাচ্চা হাতিটা একটু খোঁড়া।

বাবার বড় দুঃখ হল।

বুঝতে পারলেন মা-হাতিটা মোটেই দুষ্টু নয়। বাচ্চাটা হাঁটতে পারছিল না, তাই বোধ হয় দল থেকে পেছিয়ে পড়েছিল।

কেউ কাছে এলেই মা ভাবত ঐ বুঝি ওর বাচ্চাকে মারতে আসছে, তাই তেড়ে যেত। সাহেব সেই হাতিকে মেরে ফেলেছে।

বাবা লোকজন নিয়ে বাচ্চাটাকে উঠিয়ে আনলেন। পায়ে চোট লেগেছিল, তাই খোঁড়াচ্ছিল। ওষুধ-পত্র দিয়ে ওর পা সারানো হল।

বাচ্চা হাতিটা একেবারে পোষ মেনে গেল। মনের আনন্দে জরিপের দলের সঙ্গে ঘুরত। মজা করে একে ওকে ঠেলে ফেলে দিত। বাচ্চা হাতি ভারি আমুদে হয়!

বাচ্চাটা বড় হলে ওকে কাজ শেখানো হল। সারা জীবন ও জরিপ বিভাগেই থেকে গেছিল। সবাই ওকে ভালোবাসত!

খোকাবাবু

যার যেখানে বাস।

শুনেছি মরুভূমিতে সিংহরা সুখে থাকে, হাতিরা থাকে গভীর জঙ্গলে। কচি ডালপালা পাতা খায়, জলাশয়ে কি ঝরনায় জল খায় মানুষের ঘর-বাড়ি থেকে অনেক দূরে মনের সুখে থাকে।

মানুষ বনের জানোয়ারদের যত কষ্ট দেয় তেমন আর কেউ দেয় না। এ-কথা সকলেই বলে। তবু মাঝে মাঝে প্রকৃতি নিজেই জানোয়ারদের সর্বনাশ ঘটায়। এ-বছর তাই হয়েছিল।

হিমালয়ের গা ঘেঁষে ভুটান রাজ্য। বেশির ভাগই তার পাহাড়ে জায়গা, ঘন বন-জঙ্গলে ঢাকা।

সে-সব বনে কত রকম বুনো জানোয়ারের বাস। মাথার উপর দিয়ে ধনেশপাখি জোড়ায় জোড়ায় উড়ে যায়। দলে দলে হাতি বনের ভিতর ঘোরে। তাদের বড় একটা দেখা যায় না। তারা মানুষকে এড়িয়ে চলে।

এ-বার হল মুশকিল।

বড় বেশি বৃষ্টি পড়ে নদী-নালা সব ভেসে গেল। বানের জল কূল ছাপিয়ে পাহাড়তলির বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

দলে দলে জানোয়ার নিচু জায়গা ছেড়ে, উঁচু জায়গা খুঁজতে লাগল।

তাদের মধ্যে ছিল একদল হাতি। তারা যখন নিচু জমি ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে গেল, কি করে জানি একটা বাচ্চা হাতি মা-ছাড়া হয়ে পিছনে পড়ে রইল।

এ-দিকে বানের জল বনে ঢুকেছে, জানোয়াররা বড় বিপদে পড়েছে। তাই বন-বিভাগের লোকরা তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। তাদের মধ্যে কেউ ঐ বাচ্চা হাতিটাকে দেখতে পেয়ে, বন-বিভাগের অফিসে নিয়ে এল।

এত ছোট যে ডাল-পাতা চিবিয়ে খেতে শেখেনি। বোধ হয় মায়ের দুধ খেত।

হাতির দুধ আর কোথায় পাওয়া যাবে? শেষটা বন-বিভাগের লোকরা বড় বড় বোতলে গোরুর দুধ কিংবা পাউডার দুধ ভরে বোতলের মুখে চুষি বেঁধে, হাতির ছানাকে খাওয়াতে লাগল।

তার নাম দেওয়া হল 'খোকাবাবু'।

দেখতে দেখতে হাতির ছানাও বড় হয়ে উঠতে লাগল।

রোজ তার জন্য চল্লিশ কিলো দুধ লাগত। অন্য সব জানোয়ারদের ছানারা যত দুধ খেত, ও একাই তার বেশি খেত।

ক্যাম্পের লোকরা পড়ে গেল মুশ্‌কিলে। কচি পাতা দিলেও সে মুখে দেবে না।

তত দিনে বানের জল অনেক নেমে গেছে।

শেষে এক দিন বড় সাহেবের হুকুমে হাতির ছানাকে লরিতে চাপিয়ে অনেক দূরে বনের ধারে ছেড়ে দিয়ে আসা হল।

সবাই ভাবল এবার খিদে পেলে নিজেই কচি পাতাটাতা খাবে।

হাতি ছানাকে বনে ছেড়ে এসে সকলের মন খারাপ।

তিন চার দিন পরে সকালে হঠাৎ হাতির ডাক শোনা গেল। যেন খুব ফুর্তি হয়েছে।

সবাই বাইরে এসে অবাক হয়ে দেখে কাদা-জল ভেঙ্গে, নোংরা



ভূত সেজে, ঐ তো খোকাবাবু ফিরে আসছে!

তখন সকলের কি আনন্দ!

তাকে স্নান করিয়ে, খাইয়ে আদর করে সবাই সারা! দেখা গেল হাতিটা অনেক রোগা হয়ে গেছে।

আরো কয়েক মাস গেল।

হাতির ছানা আরো বড় হল, আরো বেশি দুধ খেতে লাগল। কোথায় পাওয়া যাবে অত দুধ? মানুষের ছেলেমেয়েরাই দুধ খেতে পায় না। তাই আবার খোকাবাবুকে বনে ছেড়ে দিয়ে আসা হল।

কিছুদিন পরে আবার সে ফিরে এল।

এমনি করে অনেক দিন কেটে গেল।

মাঝে মাঝে হাতিটাকে বনে দিয়ে আসা হত। আবার কিছু দিন পরে সে বন-বিভাগের লোকদের কাছ ফিরে আসত। কিন্তু আর কখনো তার আগের মতো সুন্দর চেহারা হল না।

বাঁচলও না বেশি দিন। বন-বিভাগের লোকদের কি দুঃখ!

—০—

বর্মার হাতি

ভারত ও বর্মা স্বাধীন হবার আগে বম্বে বর্মা ট্রেডিং কর্পোরেশন বলে একটা কোম্পানি ছিল। তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল পশ্চিম বর্মার উইউ নদীর ধারে মান্‌সি অঞ্চলে।

জঙ্গলের মধ্যে খুদে এক শহর, মনে হত যেন সর্বদা ঘুমিয়েই আছে। ছোট একটা থানাও ছিল, একজন সার্জেন্ট আর পাঁচ-ছয়জন পুলিস।

রাজধানী ছিল রেঙ্গুনে।

মানসির কাজকর্ম ছিল ঐ কোম্পানিটাকে কেন্দ্র করে।

কাঠের ব্যবসা, ঘোর জঙ্গল থেকে বিশাল বিশাল সেগুন গাছ কেটে, গুঁড়িগুলোকে বয়ে এনে নদীর জলে ভাসিয়ে মাইংথাইং বলে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হত। সেখানে গুঁড়িগুলোকে বেঁধে ভেলা বানিয়ে আরো দূরে নিয়ে যাওয়া হত।

ও-সব বনভূমির জীবনযাত্রাই ছিল এক বিশেষ ধরনের।

সেকালে এত যন্ত্রচালিত যান-বাহনের ব্যবহার ছিল না। ও-সব জায়গায় চাকায় চলা যান কিছু বিশেষ সুবিধাও করতে পারত না। কারণ পথঘাট বলে বিশেষ কিছু ছিল না। চারদিক এবড়ো-খেবড়ো, বড় বড় পাথর ছড়ানো, মোটা মোটা বাঁশঝাড়, খোঁচা খোঁচা ঝোপ।

তার উপর দিয়ে নদীর তীর অবধি প্রকাণ্ড ভারী ভারী গাছের গুঁড়ি নিয়ে যেতে হত। এ কাজ হাতি ছাড়া আর কিছু দিয়ে করা সম্ভব ছিল না। কাজেই ও-সব জায়গায় বড় বড় আস্তানা করে কর্মঠ সব হাতি রাখতে হত। তাছাড়া কোম্পানীর কর্মীরা আর মাহুতরা আর হাতি দেখাশুনা করার লোকরাও থাকত।

বুনো জায়গা। নানান্ বুনো জানোয়ার আর বিষাক্ত সাপ পোকামাকড়ের উপদ্রব ছিল।

থাকবার ঘরগুলোকে বলা হত 'বাসা'। বাসাগুলি লম্বা লম্বা খুঁটির ওপর তৈরী করা হত, তিন দিক বন্ধ থাকত, একদিক খোলা।

এতে অনেকটা নিরাপদে থাকা যেত। একটা বাঁশের বা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে, মইটাকে তুলে ফেললেই হল।

কর্মীরা প্রায় সকলেই বর্মাদেশীয় নয়তো ভারত থেকে আগত। ওপরওয়ালাদের বেশীর ভাগই ইংরেজ।

এদের মধ্যে ছিলেন আধা বর্মী জ্যাক্ সাহেব। মা বর্মী, বাবা ইংরেজ, বর্মাতেই জন্ম, কোম্পানীতে বড় কাজ করতেন।

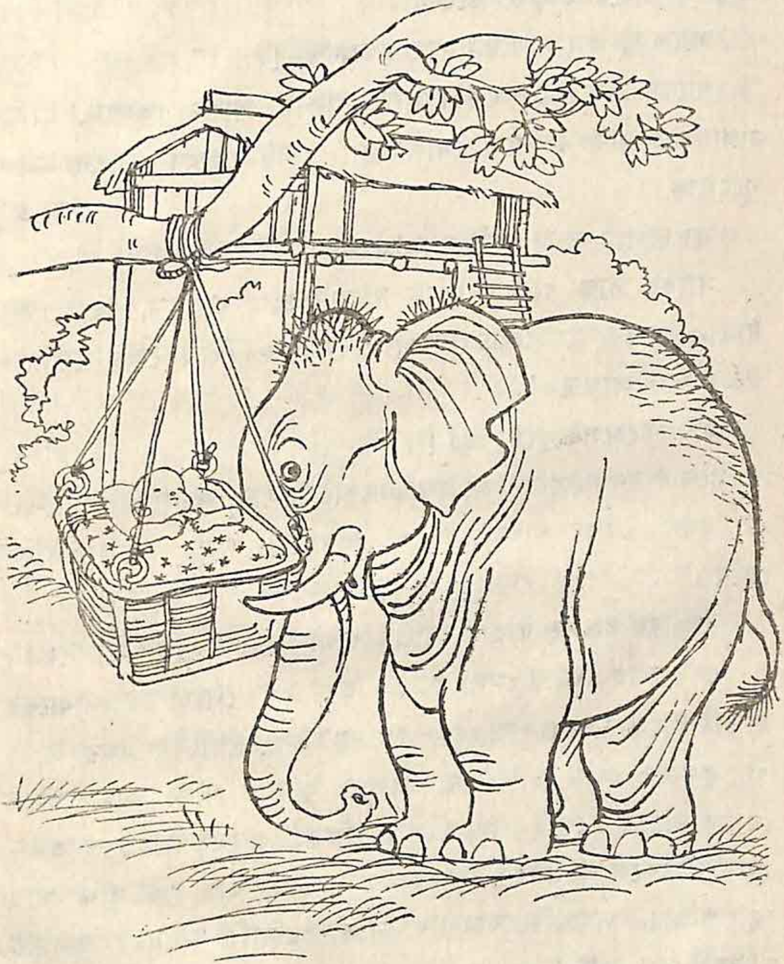
অনেক কাল পরে লেখা তাঁর বই থেকে ওখানকার কথা ভালো করেই জানা যায়।

ঘুরে বেড়ানো কাজ তাঁর।

প্রথম জীবন কেটেছিল পেগু শহরে, কাজেই কাজে যোগ দিয়ে তাঁকে আগে জঙ্গলের জীবনটাকে রপ্ত করতে হয়েছিল।

অব্যর্থ লক্ষ্য ছিল তাঁর, বেজায় সাহসী। কিন্তু জানোয়ারকে বড়ই ভালোবাসতেন, নিতান্ত বিপদে না পড়লে কখনো তাদের মারতেন না। তা সত্ত্বেও দুর্ধর্ষ বাঘশিকারী বলে তাঁর খাতির ছিল। কত শখের বাঘ-শিকারীর দলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হত তাঁকে, তার ঠিকানা নেই।

তবে বর্মার হাতির খ্যাতি সেখানকার বাঘের চেয়েও বেশি ছিল।



প্রথম যেবার জ্যাক্ সাহেব মোদে গ্রামে   রকম একটা হাতির আস্তানায় পৌঁছলেন, অবাক হয়ে দেখলেন একটা বাসার কাছে মস্ত এক গাছের তলায় একটা প্রকাণ্ড হাতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে, অথচ পা চারটে একটুও নড়ছে না।

আরেকটু কাছে গিয়ে সাহেবের চক্ষুস্থির!

গাছের ডাল থেকে একটা ছোট খোকার দোলনা ঝুলছে, হাতি মাথা দিয়ে ঠেলে সেটাকে দোলাচ্ছে। ছোট খোকা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে।

কাছেপিঠে বড়রা কেউ কোথাও নেই।

সাহেব ব্যস্ত হয়ে খোকার মাকে ডেকে বললেন, 'ওকে বড় দাঁতাল হাতির কছে ছেড়ে দিয়েছ, ছেলেটাকে পিষে মেরে ফেলতে ওর কতক্ষণ লাগবে?'

মা তো হেসেই কুটোপাটি!

'কে পিষে মারবে? আমি যখন ছোট ছিলাম, ও হাতি আমাকেও ঐ রকম দোল খাওয়াত। ও আমাদের সবার ছেলেপুলেদের দেখে।'

বাস্তবিক বড় বড় দাঁতাল হাতিও ওদের ঘরের লোক হয়ে যেত।

সেকালের বর্মায় মেলা হাতি ছিল সব পোষা জানোয়ারের মতোই। ঐ মস্ত প্রকাণ্ড দেহ, অত বড় দাঁত, মোটা থামের মতো পা, কুৎকুতে ছোট ছোট চোখ, প্রকাণ্ড কুলোর মতো কান, হঠাৎ দেখলে আতঙ্ক হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কি যে ধীরেসুস্থে চলা-ফেরা, নিঃশব্দে পা ফেলা, কি কোমল ব্যবহার, আর কি বুদ্ধি আর স্মৃতিশক্তি! অথচ বিশেষজ্ঞরা বলেন হাতির নাকি শরীরের তুলনায় মস্তিষ্কটি বেশ ছোট।

ছোট হলে কি হবে, কাজায় দক্ষ।

তবে হ্যাঁ, খ্যাপা হাতির কথা আলাদা।

জ্যাক্ সাহেব বলতেন হাতিরা মিছিমিছি খেপে যায় না। হয়তো শরীরে ক্রমাগত একটা ব্যথা-বেদনা লেগে থাকার ফলে, কিংবা অন্য কোনো কারণে মাথা গরম হয়ে ওঠার জন্য, বা কারো মন্দ ব্যবহারে চটে গিয়ে, হাতি যায় খেপে। আর খেপে গেলে সে কি ভীষণ মূর্তি ধরে! অত বড় শক্তিশালী জানোয়ারকে কেই বা তখন সামলাতে পারে! মাঝে মাঝে নিজেদের বড় ভালবাসার মানুষকে পর্যন্ত মেরে ফেলতে দেখা গেছে। আবার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই যে কে সেই।

হাতি নিয়ে যারা কারবার করে, তাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হয়।

বুনো হাতিরা পর্যন্ত খ্যাপা হাতিকে দল থেকে বের করে দেয়। তাতে অসহায় হয়ে পড়ে তার খ্যাপামি আরো বেড়ে যায়। তাই কথায় বলে একটা খ্যাপা হাতি একদল বুনো হাতির চেয়ে ভয়ঙ্কর। কারণ একলা হাতি সাধারণতঃ দল থেকে খেদানো খ্যাপা হাতিই হয়।

খ্যাপা হাতিকে সবাই ভয় পায়। বলা নেই কওয়া নেই সবাইকে আক্রমণ করে, কুঁড়েঘর মাড়িয়ে ভেঙ্গে লোকজনসুদ্ধ পিষে ফেলে। পালাতে গেলে ধাওয়া করে।

জঙ্গলের অধিবাসীরা তাই খ্যাপা হাতিকে বাঘের চেয়েও বেশি ভয় করে।

বনে হাতির দল বড় সুখে দল বেঁধে থাকে।

একজন করে দলপতি থাকে। কখনো বা একাধিক দলপতিও দেখা গেছে। দলপতিকে সবাই মেনে চলে। সেও তাদের প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে।

বিপদের সময় সে থাকে আগে। বাচ্চাগুলোকে হাতির দল বড় যত্ন করে সঙ্গে নিয়ে চলে। সামনে পিছনে বড় বড় দাঁতালরা

চলে ; মাঝে থাকে মেয়ে হাতিরা, তারা চলে বাচ্চাদের মাঝখানে নিয়ে। যে যার বাচ্চা সামলায় বাচ্চার জন্য হাতি-মা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

জ্যাক্ সাহেবের এক বন্ধুর একবার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

কোম্পানির সাহেবদের আর বন-বিভাগের কর্মীদের একটা কাজ ছিল যেমন জন্তু-জানোয়ার সংরক্ষণ, তেমনি আরেকটা কাজ ছিল দুষ্টু জানোয়ার যারা মানুষের বা অন্য জানোয়ারের ক্ষতি করে, তাদের ধরা বা মারা।

এই সাহেব দুটো বদমেজাজী হাতির ওপর নজর রাখার জন্য বুনো হাতির দলের পেছনে পেছনে ঘুরছিলেন। হাতিগুলোর যে কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বারবার সেটা তাঁর চোখে পড়ছিল।

তারা ঠিক যেন টের পেয়েছিল যে সাহেবের লক্ষ্য ঐ দুটো দাঁতাল হাতি, মেয়ে হাতি কি বাচ্চা হাতির সঙ্গে তাঁর ঝগড়া নেই, তাদের তিনি মারবেন না।

যেই না সাহেব দলের বড় বেশি কাঝাকাছি এসে পড়েন, অমনি দাঁতাল দুটো ছুটে গিয়ে মেয়ে হাতির দলের মধ্যে আশ্রয় নিতে লাগল। মেয়ে হাতিরাও তাদের ঘিরে ফেলে সাহেবের দিকে মুখ করে রুখে দাঁড়াতে আরম্ভ করল।

মেয়ে হাতি না মেরে ও দুটোকে ধরা নিতান্ত অসম্ভব দেখে সাহেব শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন। ওরা ঠিক জানত মেয়ে হাতিদের কেউ মারবে না।

এই রকম একদল হাতির পেছন পেছন যাবার সময় সাহেব একবার লক্ষ্য করলেন হাতির দল সারি সারি চলেছে, তাদের গোল গোল পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে আর তাদের পাশে পাশে ঝোপ-ঝাড়ের নিচে প্রকাণ্ড বড় বাঘের থাবার স্পষ্ট ছাপ। সে তাদের

পিছু নিয়েছে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

সাহেব একটু অবাক হলেন। কারণ একটা বাঘের পক্ষে একদল হাতিকে হারানো সম্ভব নয়। সাধারণতঃ বাঘেরা হাতির দলকে এড়িয়েই চলে।

আরেকটু ভালো করে নজর করতে সাহেবের চোখে পড়ল যে পায়ের ছাপ দেখে মনে হচ্ছে দুটো হাতি যেন দল থেকে পেছিয়ে পড়েছে।

তারপর থেকে থেকে দলটা যেন তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তারা আবার দলকে ধরে ফেলছে। যারা পেছিয়ে পড়ছে, তাদের একজনের বড় বড় পায়ের ছাপ, একজনের ছোট ছোট। মনে হয় মা-হাতি আর বাচ্চা হাতি।

সাহেব অমনি বুঝে নিলেন ব্যাপারটা কি।

বাচ্চা হাতিটা তাড়াতাড়ি চলতে পারছে না, মা তার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে চলছে। যেই তারা দল থেকে একটু পেছিয়ে পড়ছে, দলের হাতিরা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

তাতে বাঘের হয়েছে মুশকিল। বাচ্চা হাতিটার ওপর তার লোভ। শুধু মা-হাতি থাকলে যদি বা তাকে ছিনিয়ে নেবার সুবিধা করা যায়, হাতির দল কাছাকাছি থাকলে তা হবে না। কারণ এরা এতটুকু চ্যাচালেই দলবল ছুটে আসবে।

তাই বাঘ আশায় আশায় চলছে বাচ্চা হাতিটা একটু বেশি পেছিয়ে পড়লেই তাকে ধরবে। তার নিজের পেছনে যে বন্দুক হাতে সাহেব চলেছে, বাঘ তা টের পায় নি। তার সব মনোযোগ বাচ্চা হাতিটার দিকে।

বাচ্চা বেচারা ক্রমে ক্লান্ত হয়ে আসছিল, আরো আস্তে চলছিল। মা-ও সঙ্গে ছিল, শুঁড় দিয়ে থেকে থেকে তাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছিল। এমনি করে ক্রমে দল থেকে তাদের দূরত্বটা বেড়ে যাচ্ছিল।

বাঘ তো এরই অপেক্ষায় ছিল। একবার সুযোগ বুঝে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে যেই না বাচ্চাটার দিকে থাবা বাড়িয়েছে, অমনি সাহেবের গুলী এসে তার মাথায় লেগেছে। ব্যাস্, বাঘের দফা রফা।

হাতির বাচ্চাটাও তার মার সঙ্গে দলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এই তো গেল বুনো হাতির কথা। পোষা হাতির তুলনা হয় না। এত বুদ্ধি করে কাজ করতে আর কোনো জানোয়ার পারে কি না সন্দেহ। দেখতে দেখতে তারা মাহুতের কথার মানে শিখে ফেলে।

এমনি করে কুড়ি-পঁচিশটা কথা শিখে ফেলতে তাদের কোনই কষ্ট হয় না। বর্মার হাতিরা অবিশ্যি বার্মি কথাই শিখত।

মাহুত বলত, 'ইউ!' হাতি গাছের গুঁড়ি টানতে আরম্ভ করত।

মাহুত বলত, 'উং!' হাতি অমনি বুক দিয়ে, মাথা দিয়ে গুঁড়িটাকে ঠেলত।

মাহুত বলত, 'মেট!' হাতি বসে পড়ত।

মাহুত বলত, 'তা!' হাতি উঠে দাঁড়াত।

ওই ধরনের কাজের কথা হাতিরা অনায়াসে শিখে নিত।

জ্যাক্ সাহেবদের আস্তানায় মেলা হাতি ছিল, কেউ সবে জন্মেছে, কারো বয়স পঞ্চাশ।

খানিকটা বড় হলেই পিঠে বোঝা চাপিয়ে এখানে ওখানে নেওয়া-আনা করানো হত। আরো পাকা হাতিরা গুঁড়ি সরানোর কাজ করত। সে বড় শক্ত কাজ।

বছরের মধ্যে নয় মাস এই কাজ চলত। এপ্রিল, মে, জুনে বড় গরম পড়ত, তখন হাতিরা ছুটি পেত। নইলে তাদের এত বেশি ঘাম হত যে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হত।

অন্য সময় হাতিরা সপ্তাহে চারদিন করে অক্লান্ত পরিশ্রম করত, তিন দিন বিশ্রাম করত।

রোজ রাতে তাদের চরে বেড়াবার জন্য আস্তানার পাশে বনে ছেড়ে দেওয়া হত। সামনের দুই পা মোটা শিকল দিয়ে ঢিলে করে বাঁধা থাকত। চলে বেড়াতে পারে, কিন্তু বেশি দূরে যেতে পারে না।

গলায় কাঠের ঘণ্টা বাঁধা থাকত। তাদের একেকটার আবার একেক রকম সুর। সেই ঘণ্টা শুনে মাহুতরা বুঝতে পারত কার হাতি কোথায় আছে।

সকালে যে যার হাতি সংগ্রহ করে গাছ কাটার জায়গায় যেত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ কাটা হত, তাদের বেড়ই হয়তো কুড়ি-বাইশ ফুট। শিকলের সাহায্যে হাতিরা গুঁড়িগুলোকে কোথাও টেনে, কোথাও ঠেলে, কোথাও গড়িয়ে, ক্রমে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে জমা করত।

মাহুতের কাজ ছিল তাদের মাথার উপর বসে, বড় বড় কানের পিছনে পা গুঁজে, কখন কি করতে হবে হুকুম দেওয়া।

তাদের দক্ষতা দেখে দর্শকরা অবাক হয়ে যেত।

কেমন পা দিয়ে, বুক দিয়ে, মাথা দিয়ে দাঁত ও শুঁড় দিয়ে ঐ ভারী ভারী গুঁড়িগুলোকে যথাস্থানে নিয়ে এসে, ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রাখত। তারপর নদীর উঁচু পাড় থেকে ওগুলোকে গড়িয়ে জলে ফেলে স্রোতে ভাসাতে হত। তাতেও হাতিরা ছিল দক্ষ। কি ভাবে গুঁড়ি সাজালে আটকে না গিয়ে স্রোতে ভাসবে, আটকে গেলে কি ভাবে জলে নেমে তাদের জট ছাড়াতে হবে হাতিরা সব জানত।

যারা হাতির কাজ করত ক্রমে হাতির সঙ্গে তাদের বড় ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠত।

একটা লোক নাকি একই হাতির সঙ্গে পঁচিশ-ত্রিশ বছর কাজ করত। কত রকম মজাই যে হত!

হাতিগুলো যেমনি খাটতেও পারত, তেমনি তাদের মজাও ছিল নানা রকম! মাহুতকেও জব্দ করবার জন্য নাকি অনেক সময় ভোর

হবার আগে কোন হাতি হয়তো গলার ঘণ্টায় কাদা পুরে রাখত, যাতে ঘণ্টা না বাজে আর মাহুতও তাকে সহজে খুঁজে না পায়। তারপর এক সময় নিজেই এসে দেখা দিত।

যখন কাজের চাপ থাকত না, তখন মাহুতের সঙ্গে হাতির সে কি খেলা!

মাহুতের কথা মতো সামনে দু ঠ্যাং তুলে হয়তো পেছনের দু পায়ে উঠে দাঁড়াত, কিংবা সামনের দু পায়ে ভর দিয়ে পেছনের ঠ্যাং দুটো শূন্যে তুলে দিত।

শুঁড় দিয়ে জিনিসপত্র তুলত, ছুঁড়ত, কুড়িয়ে আনত। ছোট ছেলের মতোই হাতিরা কৌতুকপ্রিয় হয়।

জ্যাক্ সাহেবের হাতিদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছিল, তারাও তাঁকে খুব ভালবাসত।

তাদের অসুখে ওষুধ দেওয়া, তাদের আরামের ব্যবস্থা করা ছিল তাঁর কর্তব্যের মধ্যে। তাঁকে তারা ভালো করেই চিনে নিয়েছিল।

কথায় বলে, হাতি কোন জিনিস ভোলে না। জ্যাক্ সাহেব একটা বাচ্চা হাতির যত্ন করতেন। তারপর ওখানকার কাজের মেয়াদ ফুরোলে তিনি চলে গেলেন।

অনেক বছর পর আবার সেখানে গিয়ে, যেই ডেকেছেন 'মা আয়, আয়, আয়'। অমনি প্রকাণ্ড এক মেয়ে হাতি ছুটে এসে নেচে-কুদে একাকার!

সে-ও তাঁকে ভোলে নি।

দুঃখের বিষয় এখন আর হাতির সে আদর নেই। মেশিন দিয়ে সব কাজ হয়। হাতির সংখ্যাও কমে যাচ্ছে।

—০—

হাতি! হাতি!

দারজিলিং যাবার পাহাড়ী রেলের রাস্তাটাকে তোমরা হয়তো খুব পুরনো ব্যাপার বলে মনে কর, কিন্তু আসলে ওর বয়স একশো বছরও হয়নি।

আঁকাবাঁকা রেলের লাইন যারা তৈরি করেছিল, তাদের চাঁইরা সব সাহেব হলেও, কাজ করত শত শত দিশী লোক। তাদের মধ্যে অনেক বাঙালীও ছিল।

এখন যারা মোটরে কিংবা ছোট পাহাড়ী রেলে দারজিলিং যাও, তারা কল্পনাও করতে পারবে না, সে সময় ঐ দিকটা কি-রকম ছিল।

পাহাড়ের পাদদেশে ঘোর বন-জঙ্গল ছিল। তাতে বাঘ, ভালুক, অজগর সাপ, বুনো শূওর, হরিণ ইত্যাদির অভাব ছিল না।

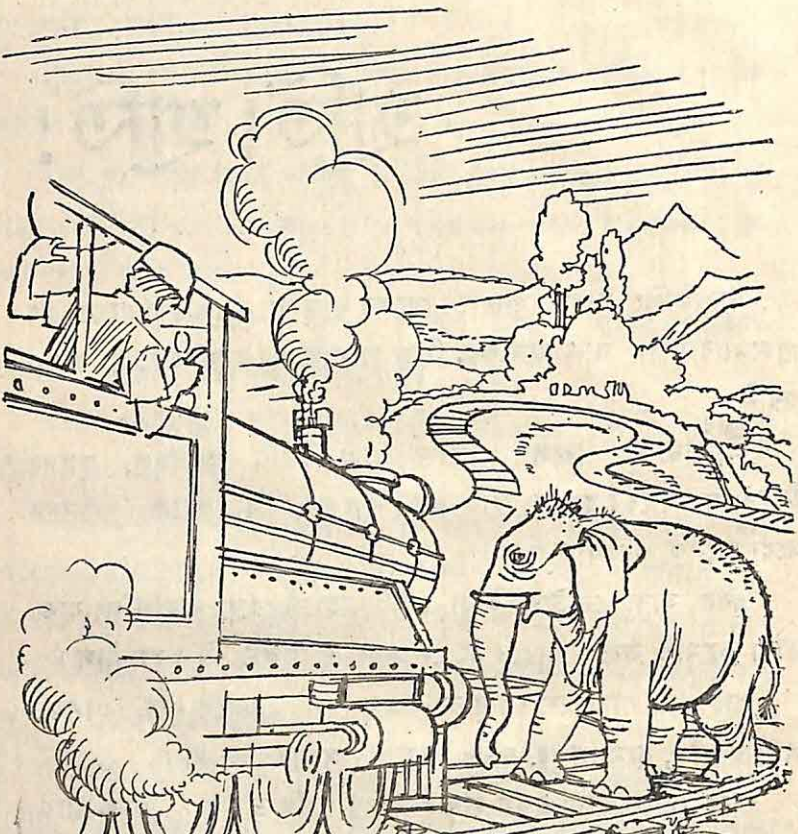
গাছে গাছে নানা রকম অদ্ভুত সুন্দর পাখি ডাকত। কিন্তু গায়ে গা লাগিয়ে বড় বড় গাছ, তাদের তলায় কাঁটা-ঝোপ, বুনো পাতা; সে জঙ্গলে এগোয় কার সাধ্য!

তবে অর্কিড ফুলের গন্ধ পাওয়া যেত।

সেই বন কেটে পথ তৈরি শুরু হল।

পাহাড়ের আগেই বন; সেখানে বসতি নেই, দোকানপাট নেই।

ছোট ছোট নদীতে কি ভীষণ স্রোত, তার ওপর পুল নেই। লট-বহর নিয়ে দু-পা এগুতে হলেই গাছ কেটে পথ করে, নদীর



এপার-ওপার কাটা গাছের গুঁড়ি পাশাপাশি দু-তিনটে ফেলে, তবে এগুতে হত।

এক মাইল যেতে হয়তো চার দিন সময় লাগত।

আর শুধু এগিয়ে যাওয়াই নয়, সঙ্গে সঙ্গে রেলের লাইন বসবে তার ব্যবস্থা করতে করতে যাওয়া।

জরীপের লোকরা, এঞ্জিনিয়াররা আগেই জমি দেখে, মেপে, কোথায় কি করতে হবে, তার নক্সা এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে। দলের মধ্যেও অনেক এঞ্জিনিয়ার আছে, তারা হাতে-কলমে কাজ করবে।

দল বলতে শুধু একটা দল-ই নয়। তা হলে এমন এলাহি ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে যে, সামলানো যাবে না। তাদের খাওয়া-দাওয়ার থাকার জায়গা, জিনিসপত্র মজুত রাখার জায়গা, ডাক্তার, ওষুধপত্র, যন্ত্রপাতি, ভারবাহী ঘোড়া, খচ্চর, সব নিয়ে কি কাণ্ডটাই না হয়েছিল সে ভাবা যায় না।

সুবিধার জন্য বড় দলটাকে ছোট ছোট দলে ভাগ করা হল। না করে উপায় ছিল না, দরকারও ছিল।

একদলের কাজ শেষ হলে সেই জায়গাতেই আরেক দলের কাজ শুরু হবে।

প্রথম দল হয়তো দড়ি বেঁধে মাপ নিতে নিতে, পথের গাছপালা কাটতে কাটতে, বড় বড় পাথর সরাতে বা ভাঙতে ভাঙতে এগুল। এদের কাজ যে কত কঠিন সে তো বোঝাই যাচ্ছে। সময়ও নিত নিশ্চয়।

প্রথমেই একটা ক্যাম্প হল; সেখানে লোকজন, জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি সব জমা হল।

সেখান থেকে প্রথম কাজের দল বেরিয়ে পড়ল।

গাছ কাটার কাজ একটু এগোলেই পথ তৈরির কাজ, পুল বানানোর কাজ। তারপর রেল বসানো।

একেক দল তাদের কাজ সেরে এগিয়ে গিয়ে হয়তো দুই মাইল দূরে নতুন ক্যাম্প বসায়। অমনি পরের দল ওদের ছেড়ে যাওয়া ক্যাম্প দখল করে, তাদের কাজ সারে।

ততদিনে প্রথম দল আরো এগিয়ে আরেকটা নতুন ক্যাম্প করেছে। দ্বিতীয় দল তাদের ক্যাম্পে গিয়ে উঠেছে। তৃতীয় দল দ্বিতীয় দলের ক্যাম্পে পৌঁছেছে।

এই ভাবে একটু একটু করে দারজিলিং-এর পাহাড়ী রেলপথ এগোতে লাগল।

মাঝখানে কত বাধা, কত বিপদ। অসুখ-বিসুখ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর। বুনো জন্তুর আক্রমণ।

নানা রকম মজাও হত। যে-দিন হরিণ বা বুনো শূওর মারা হত, সেদিন রাতে ক্যাম্পে মহা ফুর্তি, খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা।

বনের মধ্যে গাঁ থেকে আদিবাসীরা এসে মাঝে মাঝে আনন্দে যোগ দিত।

একবার এক বেয়াড়া বুনো হাতি আড়ভাবে নতুন পাতা লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে রইল; সে নড়েও না, চড়েও না। এদিকে এঞ্জিন চালিয়ে নতুন লাইন পরীক্ষা করা হবে। এঞ্জিন তৈরী, অথচ হাতি নড়ে না।

কেউ বলল সিটি দিলেই বাছাধন ভাগবে।

সিটি দেওয়া হল।

হাতি একটু ল্যাজ দোলাল।

আরেকজন বলল শূন্যে বন্দুকের গুলি ছুঁড়লে আর ওকে দেখতে হবে না।

সাহেব এঞ্জিনিয়ার বেরিয়ে এসে বন্দুক দিয়ে শূন্যে গুড়ুম্ গুড়ুম্ করে কতকগুলো ফাঁকা আওয়াজ করল।

হাতি দু-একবার চোখ পিটপিট করল।

মনে হল ওর হাসি পাচ্ছে।

তারপর এঞ্জিনে কয়লা-ভরার ছোকরা বলল, 'আচ্ছা, ফোঁস্ ফোঁস্ করে খুব জোরে খানিকটা বাষ্প ছাড়লে কেমন হয়?'

যেই না হু—শ্—শ্ !—হু—শ্—শ্ ! হ্যা—শ্ !!—হ্যা—শ্—শ্ !! করে খানিকটা বাষ্প ছাড়া হয়েছে, হাতিও অমনি পাঁই-পাঁই করে ছুটে বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে।

আর এঞ্জিনও আস্তে আস্তে নতুন লাইনের ওপর দিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে।

দর্শকরা সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল!

—০—



হাতির মা

বেশির ভাগ বুনো জানোয়ার সারা রাত যেখানেই ঘুরে বেড়াক না কেন, ভোর হবার কিছু আগে কোনো নদী বা পুকুরের ধারে এসে পেট ভরে জল খেয়ে নেয়। যাতে দিনের আলোয় আবার জল খেতে আসতে না হয়। কারণ দিনের আলোয় দেখা দেওয়া মানেই নিতান্ত অসহায় অবস্থায় শত্রুর চোখে পড়া। তাই ভোর আর সন্ধ্যা হল ওদের জল খাবার উপযুক্ত সময়।

এই সময়গুলো কিন্তু ছবি তোলার পক্ষে খুব ভালো নয়।

সুখের বিষয় হরিণ, হাতি ইত্যাদিকে দিনের বেলায়ও যথেষ্ট দেখা যায়। আর জলাশয়ের কাছে নোনা-পাথর থাকলে তো কথাই নেই।

জল খেয়ে সব জানোয়ার সেই নোনা-পাথরে দুই-এক চাটন দিয়ে যায়। তাদেরও শরীর রাখার জন্য নুনের দরকার হয়।

একবার আমাদের এক ক্যামেরা-ম্যান বন্ধু কারো কাছে একটা ছোট জলাশয়ের কথা শুনেছিল, তার পাশে নোনা-পাথরও ছিল। সেখানে দিনের বেলাতেও অনেক জানোয়ার জল খেতে আসত।

জলাশয়টা খুবই ছোট, তাকে একটা গভীর গর্তও বলা যায়। ইংরেজিতে একে বলে 'ওয়াটার-হোল'। বন্ধুর ইচ্ছা কোন জানোয়ার কি ভাবে জল খায়, তার ছবি তোলে। তাই বিকেল থাকতেই সে গিয়ে একটা গাছে উঠে বসল। তখন জলাশয়ের ধারে কেউ ছিল না



একটু পরেই প্রকাণ্ড একটা পুরুষ হাতি এসে জল খেতে লাগল। জল খাচ্ছে তো জল-ই খাচ্ছে। তার জল খাওয়ার বহর দেখে বন্ধু তো অবাক হয়ে গেল।

এদিকে বন থেকে একটা বাচ্চা হাতিও বেরিয়ে এসে জলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু জল অবধি এগুতে সাহস পেল না।

বুড়ো হাতিটা তাকে দেখেই চটে গেল। শুঁড় নেড়ে তেড়ে এল, সে বেচারা অমনি জঙ্গলের দিকে ভাগল।

বুড়ো আবার জল খেতে আরম্ভ করল।

হঠাৎ তার পিছন দিক থেকে বাচ্চা হাতিটা আবার এসে হাজির হল। এবার তার সঙ্গে তার মা-ও এসেছিল। মা-হাতি গায়ে-পায়ে বুড়ো হাতির চাইতে একটুও ছোট ছিল না। মা আর ছেলে চুপ করে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

তারপর বাচ্চাকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে, মা একা এগিয়ে এসে শুঁড় তুলে বুড়োর পিছনে এমনি জোরে সপাৎ করে এক বাড়ি মারল যে বুড়ো আৎকে উঠে এক মুহূর্তও দেরি না করে, ল্যাজ তুলে বনের দিকে দৌড় দিল।

তখন মা বাচ্চার দিকে তাকাতেই, সে এগিয়ে এসে পেট ভরে জল খেল।

তারপর মা-ও জল খেয়ে, বাচ্চা নিয়ে হেলে দুলে বনে ফিরে গেল।

বন্ধুও গাছ থেকে নেমে এসে, আস্তানার দিকে চলল। তার মনে হল মানুষে আর জানোয়ারে আসলে খুব বেশি তফাত নেই।

—০—

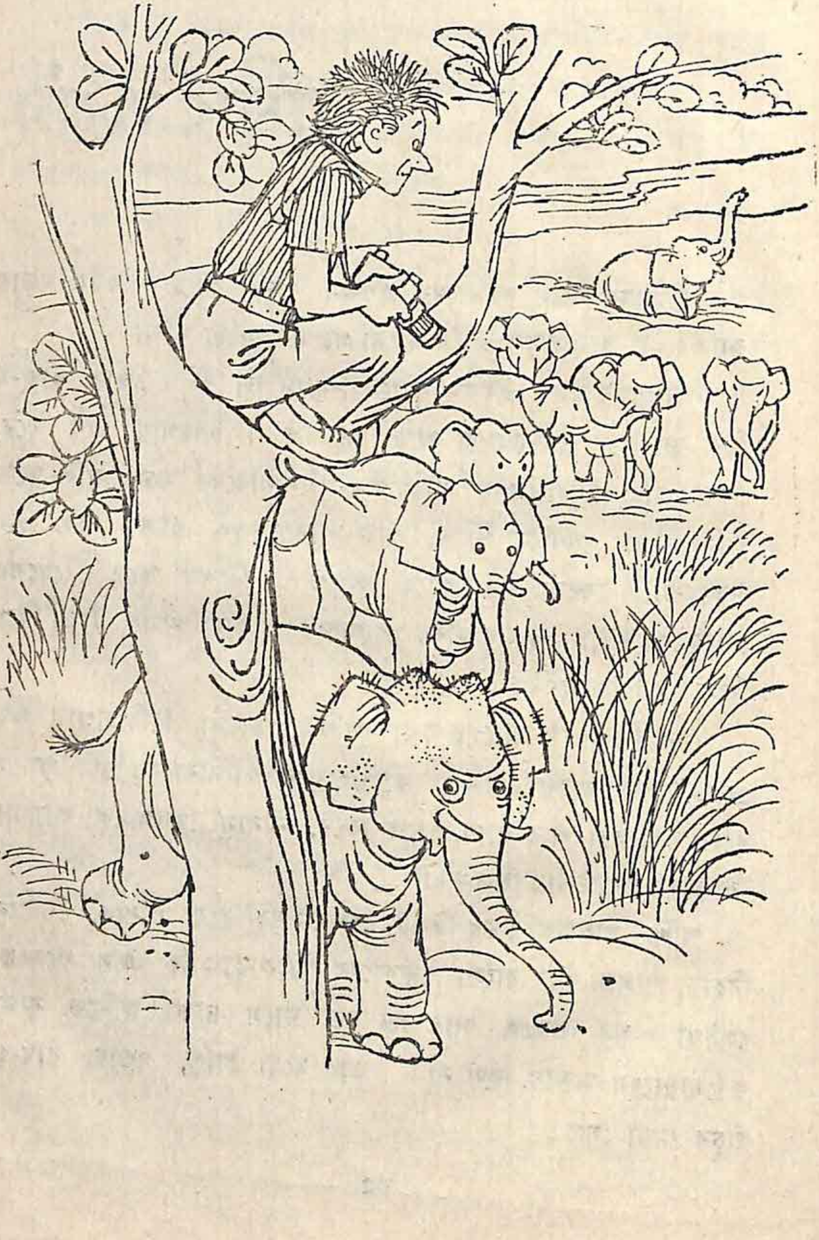
হাতির ফটো

শান্তিনিকেতনে আমাদের একজন বন্ধুর কাছে একটা মজার হাতির গল্প শুনেছিলাম। বানানো গল্প নয়, সত্যি ঘটনা।

আমাদের বন্ধুর একজন ক্যামেরা-ম্যান বন্ধু ছিল। তার কাজ-ই ছিল ভারতের বনে-জঙ্গলে আর অল্প জানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে, সেখানকার অধিবাসীদের আর জন্তু-জানোয়ারদের সচল ছবি তুলে আনা। যে যেখানে থাকে, সেই পরিবেশসুদ্ধ এইসব সচল ছবি ডকুমেণ্টারি ফিল্মে খুব কাজে লাগে। বিশেষ করে বিদেশের লোকদের কাছে এই সব ছবির খুব আদর। তারা অনেক টাকা দিয়ে ফিল্মগুলো কিনে নিত।

বেশ কিছুকাল আগের কথা বলছি। তখনো কাজিরাঙ্গায় জন্তু ছেড়ে রাখার ব্যবস্থা হয়নি। কাজেই বুনো জানোয়ারের ছবি তুলতে হলে, ক্যামেরা আর প্রাণ হাতে করে, নানান্ বিপজ্জনক জায়গায় যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

পশ্চিম বাংলার উত্তর দিকটা যেখানে সরু হয়ে এসেছে, যেখানে বিহার, আসাম আর বাংলা পরস্পরের বড় কাছাকাছি এসে পড়েছে, সেইখানে ঘন জঙ্গলে আর বড় বড় ঘাসে ঢাকা জমিতে বুনো জানোয়ারের অভাব ছিল না। তার মধ্যে হাতি, গণ্ডার, বাঘ-ও প্রচুর দেখা যেত।



ক্যামেরা-ম্যানের খুব ইচ্ছা হাতির আর গণ্ডারের ছবি তোলে। এ-সব জানোয়ারকে ইংরেজিতে 'প্যাচিডার্ম' বলে। তার মানে যে জানোয়ারের চামড়া খুব পুরু।

গণ্ডার নাকি বেজায় হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, আর রেগে গেলে ঐ ভারী শরীর নিয়েও ভীষণ বেগে দৌড়াতে পারে। তবে চোখে নাকি খুব বেশি দূর দেখতে পায় না।

কোথায় জানোয়ারদের আনা-গোনা সব চাইতে বেশি, গাঁয়ের লোকদের কাছে জেনে নিয়ে, অনেক ভেবেচিন্তে বন্ধু এক বুদ্ধি ঠাওরাল। আগে থাকতে ঐখানে গিয়ে, নিজের নিরাপত্তার জন্য এখানে-ওখানে কয়েকটা উঁচু আর মজবুত গাছ দেখে রাখল। যাতে তেমন তেমন অবস্থা দেখলে টপ্ করে চড়ে পড়া যায় কিংবা আগে থাকতেই উঠে বসে, নিরাপদে ছবি তোলা যায়। জানোয়াররা টেরও পাবে না।

কিন্তু কপাল তার মন্দ ছিল। দূর থেকে ছায়ার মতো দু'চারটে গণ্ডার দেখলেও, এতটা কাছে কাউকে পাওয়া গেল না যে ছবি তোলা যায়।

প্রায় হতাশ হয়েই বন্ধু ফিরে আসছিল, এমন সময় একজন আধিবাসীকে দেখতে পেল, নদীর দিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে সে ছুটে আসছে।

কি ব্যাপার? না, বুনো হাতির দল আসছে, নদী পার হবে মনে হয়।

বন্ধু আর দাঁড়াল না। দৌড়তে দৌড়তে নদীর কাছে পৌঁছে একটা মজবুত গোছের গাছ দেখে, তাতে চড়ে বসে, ক্যামেরা তৈরী করে রাখল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, বন থেকে হাতির দলকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল।

হাতিরা সাধারণতঃ তাদের চলাফেরার জানান দেয় না। অত বড় জানোয়ার যে কি নিঃশব্দে চলতে পারে, দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। তবে কোনো কারণে ভয় পেয়ে, কিংবা রেগে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটবার সময় বিকট চিৎকার করে।

এই হাতিরা নিঃশব্দে এগোতে লাগল। সামনে, পিছনে, দুপাশে বড় বড় পুরুষ হাতি, মাঝখানে মেয়ে হাতিরা তাদের বাচ্চাদের আগলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখা গেল।

নদীর ধারে অনেকখানি বালি। তার ওপর দিয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে হাতির দল নদী পার হবার চেষ্টা করছিল। আগে যারা যাচ্ছিল, হঠাৎ সেই পুরুষ হাতির দলের মধ্যে একটা বিকট চ্যাঁচাতে লাগল। অমনি দলসুদ্ধ সকলে যে যেখানে ছিল, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

ক্যামেরা-ম্যান উৎসুক হয়ে দেখল একটা হাতি নদীর ধারের বালিতে ডুবে যাচ্ছে। ঐ-সব নদীর ধারে মাঝে মাঝে চোরাবালি থাকে, তার তল পাওয়া যায় না। কিছু পড়লে অমনি ডুবে যায়। কোনো জানোয়ার বা মানুষ পড়লে, সাধারণতঃ তারা প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় খুব হাত-পা ছোঁড়ে। তাতে আরো তাড়াতাড়ি ডুবে যায়।

এই হাতিটা কিন্তু ঐ দু'বার চিৎকার দিয়ে পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল। হাতিদের নিয়ম খুব সাবধানে মাটি পরীক্ষা করে চলা, এই দুর্ঘটনাটা দৈবাৎ কেমন করে হয়ে গেছিল।

অন্য হাতিরা কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরেই পুরুষটা চটপট কাজে লেগে গেল।

মা-হাতিরা বাচ্চাদের নিয়ে, নদীর তীরে নিরাপদ উঁচু জমিতে, বাচ্চাদের মধ্যিখানে রেখে, বাইরের দিকে মুখ করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পুরুষরা দৌড়ে বনের ধারে গিয়ে বড় বড় ডাল ভাঙতে লাগল।

তাই দেখে আমাদের বন্ধুর সে কি ভয়! যদি এই গাছটার ওপর ওদের নজর পড়ে! তবে সে যথেষ্ট উঁচুতেই বসে ছিল, তাছাড়া যে কারণেই হোক, এ গাছটার কাছে কেউ আর এল না।

হাতিরা বড় বড় ডাল ভেঙে, সেগুলোকে নিয়ে চোরাবালির চারদিকে গোল করে ফেলতে লাগল। ক্রমে ডাল ফেলে তারা তাদের বিপদে-পড়া সঙ্গীর একেবারে কাছে পৌঁছে গেল। অত দূর থেকে অবশ্য সমস্তটার ছবি তোলা গেল না, তবু যা গেল সেই যথেষ্ট।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাছের ডালের ওপর সামনের পায়ে ভর দিয়ে, আস্তে আস্তে সেই হাতিটা উঠে এল। তারপর গাছের ডালের বিছানার ওপর দিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে এল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য পুরুষ হাতিরা সন্তর্পণে পা দিয়ে চেপে চেপে মাটি পরীক্ষা করে, নিরাপদে নদী পার হবার জায়গা খুঁজতে শুরু করল।

এতক্ষণ মা-হাতিরা আর তাদের বাচ্চারা ঠিক যেন বিপদের কথা বুঝতে পেরে চুপ করে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার বাচ্চা-গুলো মহা ফুর্তিতে শুঁড় তুলে লাফালাফি করতে লাগল। আরো কিছু পরে, ভালো জায়গা দেখে হাতির পাল নদী পার হয়ে ওধারের বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমাদের ক্যামেরা-ম্যানও খুশিমনে গাছ থেকে নেমে, ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে ডেরায় ফিরে এল। ছবিগুলো কোনো বিদেশী কোম্পানির জন্য তোলা হয়েছিল, তারাও মহা খুশি।

—০—

হাতির জয়

আমার ছোট বোন লতিকার স্বামী হলেন জিয়লজিস্ট, তার মানে ভূ-বিজ্ঞানী।

তাদের কাজ-ই হল আমাদের পায়ের তলার মাটিটা কি রকম জিনিস, তাই-নিয়ে গবেষণা করা। কোথায় মাটির নিচে কিসের খনি আছে, কি রকম তেল আছে, তারা তাই খুঁজে বেড়ায়।

বেশ কয়েক বছর আগে তিনি ভুটানের পাহাড়ের পায়ের কাছে খোঁড়াখুঁড়ির কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

পাহাড়ের পায়ের কাছটা কি রকম জায়গা, সে তো তোমরা জানই। নদী-নালা ও বৃষ্টি থেকে ভয়ঙ্কর বেশি জল পেয়ে পেয়ে ওখানকার গাছপালা এমনি ঘন বন হয়ে দাঁড়ায় যে সেখানে মানুষের যাতায়াত করা কষ্টকর।

এদেরও বন কেটে ভিতরে ঢুকতে হত, গাছপালা কেটে ক্যাম্প করতে হত। কাঠের তো অভাব ছিল না, গাছ কেটে বাড়িঘর, আসবাব তৈরি করা হত।

তার ওপর বুনো জানোয়ারের ভয়-ও ছিল। তাই ক্যাম্পের চারদিকে দেড় মানুষ উঁচু শক্ত কাঠের বেড়া দেওয়া হত। সে বেড়া দিয়ে ছোটখাটো জন্তুর উপদ্রব থেকে বাঁচা যেত বটে, সাধারণ হায়না,

ভালুকও ঠেকানো যেত ; কিন্তু যাকে ঠেকানো সম্ভব হত না, সে হল হাতি।

সুখের বিষয়, ঐ অঞ্চলে হাতির তেমন উপদ্রবের কথা শোনা যায় নি।

কিন্তু বুনো হাতির দল ছিল ওখানে।

রাতে ক্যাম্পের বাতি নিবে যেত, শুধু পাহারাওয়ালাদের একটা ধুনি জ্বলত। এ ঘন বনে তার আলো বেশি দূর পৌঁছত না। মনে হত চার ধারের আকাশছোঁয়া গাছগুলো যেন বড্ড কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।

গভীর রাতে অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে লতিকা শুনতে পেত বাইরে কিসের একটু একটু মট্ মট্ শব্দ আর থেকে থেকে জোর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ার মত ফোঁস্ ফোঁস্।

লতিকার স্বামী বলতেন, "ও কিছু না, বুনো হাতির দল এসেছে। ওরা কাউকে কিছু বলে না, যদি না ওদের কোনো ক্ষতি কর। পায়ের চাপে শুকনো কাঠকুটো ভাঙছে, তাই মট্ মট্ করছে, নইলে ওরা নিঃশব্দে হাঁটে। আর অত লম্বা শুঁড় দিয়ে নিশ্বাসের শব্দ তো হবেই।"

মনে আছে ছোটবেলায় বাবার মুখেও ঐ কথা শুনেছি।

বুনো হাতির দল তত ভয়ের নয়, যত ভয় বনের মধ্যে একলা হাতি। তার কারণ হাতিরা দল বেঁধে থাকে, দলের নিয়ম মেনে চলে। দুষ্টু হাতি আর খ্যাপা হাতিদের ওরা দল থেকে বের করে দেয়। তারাই একলা একলা ঘুরে বেড়ায়, অন্য জানোয়ার কিংবা মানুষ দেখলে তেড়ে আসে।

হাতির দল থাকতেও ভালোবাসে গভীর জঙ্গলে। কোনো কারণে সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হলে, তবেই তারা গ্রামে উৎপাত করে, ফসল খেয়ে ফেলে।

বাবার লেখা বইয়ে পড়েছি, একবার বর্মার জঙ্গলে জরীপ করতে

গিয়ে, দেখেছিলেন অনেক দূরের পাহাড়ে ধ্বস নেমেছে, অনেকখানি মাটি ধ্বসে গেছে। তলাকার লালচে পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে আর তারি ওপর দিয়ে কালো স্রোতের মতো কি যেন নেমে আসছে!

বাবা তো তাই দেখে অবাক্!

গাঁয়ের খালাসীরা বলল, "ও কিছু নয়, ও হল গিয়ে হাতির পাল। ওদের চরে বেড়াবার জায়গা নষ্ট হয়েছে তাই অন্য জায়গার খোঁজে নেমে আসছে। মানুষদের বাড়ির কাছে ওরা আসবে না।"

তবে ভুটানের পাহাড়ের পায়ের কাছের বনে তো আর হাতিরা আসেনি। ওটা আসলে ওদের-ই ঘুরে বেড়াবার জায়গা, তাই হয়তো রাতে বেড়াতে আসত।

লতিকার কিন্তু সর্বদা ভয় করত। কখনো বা তারার আলোয় দূরে দেখতে পেত ওদের। মনে হত ছোট ছোট পাহাড়ের ছায়া সরে সরে যাচ্ছে।

একবার লতিকা ক্যাম্পে একা ছিল, কিছু লোকজন ও ছিল রাঁধা-বাড়া, কাজকর্মের জন্য; বাকি সকলে ওর স্বামীর সঙ্গে অন্য জায়গায় কাজে গেছিল।

ক্যাম্পের পাশেই নদী, তাতে এ সময়ে জল খুব কম থাকাতে, তার ওপর দিয়ে ওরা জীপে করে সহজেই যাওয়া-আসা করত। সেদিন কিন্তু এমনি বৃষ্টি পড়ল যে নদীর জল কূল ছাপিয়ে উঠল। কোনো জীপের সাধ্য ছিল না যে পার হয়। কাজ করতে যারা গেছিল, তারা কর্মস্থলেই আটকা পড়ল। মাঝখানে দু-তিনটে নদী, তার কোনোটাই পার হওয়া যায় না।

রাতে হাতিরা না এলেও, নদীর গর্জনে ঘুমোয় কার সাধ্য! তারপর এক সময় ভোর হল। বৃষ্টি থেমে যাওয়াতে নদীর জলও একটু কমল। কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা, যে কোনো সময় আবার বৃষ্টি নামতে পারে। ক্যাম্পের লোকরা বলল যে এ-ভাবে ওরা অনেক



সময় সাত-আট দিন পর্যন্ত বন্দী হয়ে থেকেছে।

লতিকার ভাবনা হল ; ওকে ফিরতেই হবে, কলকাতায় জরুরী কাজ ছিল।

দুপুরের দিকে হাতি চেপে ক্যাম্পের রসদ নিয়ে লোক এল। সে বলল ঐ হাতিতে করেই লতিকাকে ফিরতে হবে। ওর স্বামীই লোকটিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এ অবস্থায় হাতি ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। তাও এত জল যে হাতিটার পা-গুলো ডুবে যাচ্ছিল, শুধু পিঠটা আর মাথাটা জলের ওপরে ভেসে ছিল।

যে নিতে এসেছিল, সে বলল, "পা ঝুলিয়ে বসতে হবে মা, জলে পা ডুবে থাকবে। সাহেবের গাম্-বুট পরে নিন্।"

শেষ পর্যন্ত তাই করতে হল।

বুট বেজায় বড়, পায়ে হল্ হল্ করতে লাগল। জিনিসপত্র, স্যুটকেস ইত্যাদি নিয়ে, বর্ষাতি গায়ে দিয়ে, হাতির গলার কাছে লতিকা পা ঝুলিয়ে বসল। অন্য লোকরা হাতির পিঠে বসল।

খুব সাবধানে হাতি পার হতে লাগল।

স্রোত এত বেশি যে ভয় হচ্ছিল এই বুঝি ঠ্যাং ধরে টেনে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তা নিল না বটে, কিন্তু পা থেকে এক পাটি গাম্-বুট খুলে, সেটি ভাসিয়ে নিয়ে চলল।

হাতির চাইতে স্রোতের বেগ বেশি ছিল, গাম্-বুট হাতির মাথার পাশ দিয়ে ভেসে চলল। অমনি হাতি শুঁড় বাড়িয়ে গাম্-বুট তুলে লতিকাকে দিল। দেবার সময় লতিকা ওর চোখের দিকে চাইল। মনে হল হাতি মিটি-মিটি হাসছে।

সঙ্গে সঙ্গে লতিকার মন থেকে হাতির ভয়, স্রোতের ভয়, সব দূর হয়ে গেল।

—০—

মস্তান

বুনো হাতি ধরার যত রকম নিয়ম আছে, তার মধ্যে নাকি যে-নিয়মে সেকালে আমাদের বাংলায় হাতি ধরা হত, সেইটেই সব চাইতে ভালো।

আজ অবধি ঐ নিয়মেই বেশির ভাগ হাতি ধরা হয়। সেই সব পুরনো নিয়ম হস্ত্যায়ুর্বেদ বলে পুরনো পুঁথিতে লেখা আছে।

তবে হাতি-ধরার সে-দিন আর নেই।

সেকালে বড় লোকেরা হাতি পুষতেন, রাজা-রাজড়ারা হাতি চেপে বাঘ-শিকারে যেতেন। তা ছাড়া সাধারণ লোকেরাও হাতি পেলে বেঁচে যেত; পথ-ঘাটে কাদা, রেল নেই, জীপ নেই, ট্রাক নেই। কাজেই হাতি-ধরার ব্যবসাও চলত ভালো।

এখন শখ করে ছাড়া কেউ হাতি চাপে না, হাতির কাজ জীপ দিয়ে চালানো হয়, তাই হাতির দরকার কমে গেছে।

আর দুঃখের বিষয় হাতির দাঁতের লোভে লোকে এত বেশি হাতি মারত যে হাতির সংখ্যা বড়ই কমে গেছিল।

আজকাল যাকে-তাকে হাতি ধরতে দেওয়া হয় না। খ্যাপা হাতি লোকের ক্ষতি করছে দেখতে না পেলে, কাউকে হাতি মারতেও দেওয়া হয় না। তাতে হাতির সংখ্যা নাকি কিছু বেড়েছে, বিশেষ করে তাদের জন্য অভয়ারণ্য তৈরী করার পর।

সে যাই হোক, এই হাতি ধরার ব্যাপারটি বড় চমৎকার।

বুনো হাতি ধরা খুব সহজ নয়, ওস্তাদ লোক না হলে কেউ পারেও না। একে হাতির গায়ে ভয়ঙ্কর জোর, বুদ্ধিও প্রখর, তার ওপর ওরা দল বেঁধে ঘোরে, একজন করে পালের গোদা থাকে, সে বুদ্ধিতে আর বলে দলের সবার ওপরে।

দলের সব হাতিরা তাকে মেনে চলে। মেয়ে হাতিরা আর বাচ্চারা তো চলেই, খুব বুড়ো আর জোয়ান হাতিরাও তাকে মানে।

যে মানে না, তাকে হয় পালের গোদাকে যুদ্ধে হারিয়ে নিজে পালের গোদা হতে হয়, নয় তো দল ছেড়ে চলে গিয়ে, নিজের অন্য দল পাকাতে হয়।

পালের গোদা হওয়া খুব সহজ কথা নয়, তাকে হতে হয় নেতা, রাজা, পাণ্ডা, সরদার যাই বল।

চরে বেড়াবার ভালো জায়গা তাকে খুঁজেই বের করতে হয়।

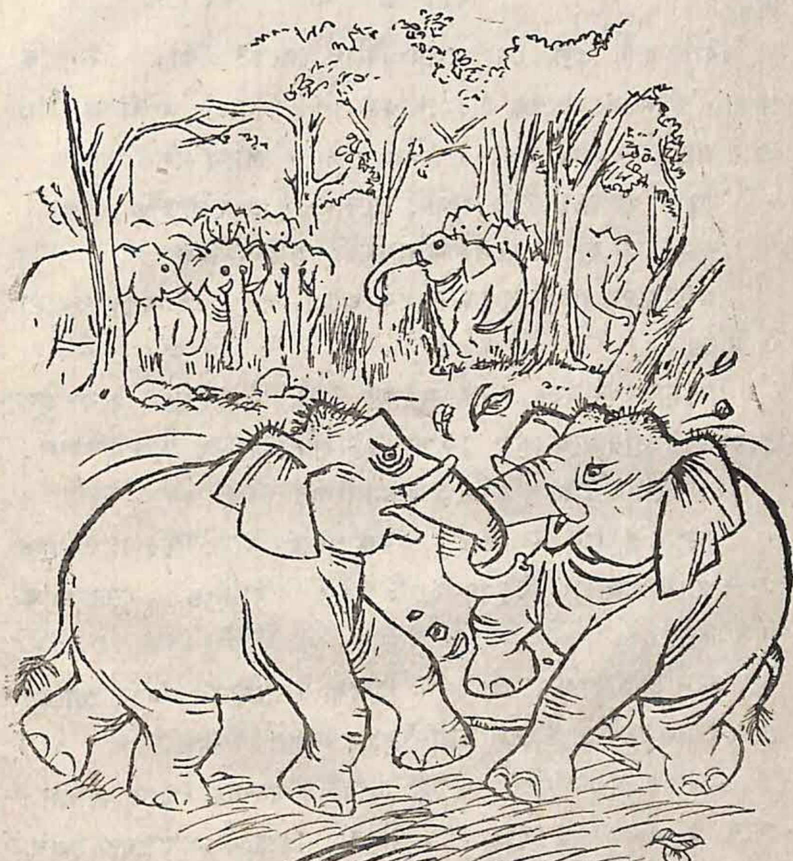
বাঘ ভাল্লুক, অন্য হাতির দলের কাছ থেকে কিংবা মানুষের হাত থেকে নিজের দলকে সে-ই রক্ষা করে।

তাকে যেমন সকলে মেনে চলে, সে-ও তেমনি তাদের জন্য সর্বদা প্রাণ দিতে তৈরী।

এই রকম একটা হাতির নাম গ্রামের লোকেরা দিয়েছিল 'মস্তান'। 'মস্তান' মানেই সরদার, সাধারণতঃ গুণ্ডা জাতের লোকেদের বলে সরদার। 'মস্তানে'র দলের জোয়ানদের-ও যেমনি গায়ের জোর ছিল, তেমনি সাহস-ও ছিল। সরদারকে ছাড়া কাউকে তারা জানত না।

মস্তানের দলকে গ্রামের লোকেরা চিনলেও, হাতিরা তাদের এড়িয়েই চলত।

হাতিরা থাকত ঘন বনে, যেখানে মানুষের বাস ছিল না। 'মস্তান' তাদের সব রকম বিপদ থেকে চিরকাল রক্ষা করে এসেছিল, অন্য হাতির দল বড় একটা কাছে ঘেঁষত না।



নিরাপদেই ছিল ওরা, দল বেড়ে বেড়ে দেড়শো দুশোতে দাঁড়িয়েছিল। তাদের ডাকে পাহাড় কাঁপত, গ্রামের লোকেরা বলত 'ঐ যে মস্তানের দল!' তারা চেনা হাতির দলের খোঁজ-খবর রাখত।

বিপদ যখন এল, সে দলের ভিতর থেকেই এল। এমন কি 'মস্তানে'র নিজের ছেলের কাছ থেকেই এল। মেঘের মতো কালো, প্রায় 'মস্তানে'র মতই বড় সেই হাতি। তাকে লোকে বলত 'ঝড়'।

'মস্তান' যত বুড়ো হতে লাগল, 'ঝড়ে'র বল ততই বাড়তে থাকল।

শেষে এমন হল যে দলের মধ্যে দুটো দল দেখা দিল।

জোয়ানদের দল 'ঝড়ের চারদিকে জড়ো হল। এর আগে কখনো এমন হয়নি।

'মস্তান' যখন নতুন বনের সংকেত দিল, 'ঝড়' অন্য দিকে মুখ ফেরাল। তার সঙ্গে সঙ্গে এক দল কম-বয়সী হাতিও মুখ ফেরাল।

সারি বেঁধে তারা অন্য দিকে রওনা দিল।

'মস্তানে'র তখন বয়স হয়েছে, কিন্তু পর্বতের মতো চেহারা, বজ্রের মতো গায়ের জোর। উঁচু একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সে যুদ্ধে ডাক দিল।

এমন ডাক তার দলের কেউ কখনো শোনেনি। দূরে গ্রামের লোকেরাও সেই ডাক শুনে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

মনে হল বাতাস বওয়া বন্ধ হল, চারিদিক থম-থম করতে লাগল। মেয়ে হাতিরা কিছু দূরে সরে গিয়ে, মাঝখানে বাচ্চাদের রেখে, বাইরের দিকে মুখ করে, গোল হয়ে দাঁড়াল।

'মস্তানে'র দলের পুরুষ হাতিরা কাঠ হয়ে তার পিছনে দাঁড়াল।

সে ডাক 'ঝড়ে'র কানেও গেছিল। তার দলের পুরুষরা থমকে দাঁড়াল। চিরকাল তারা 'মস্তান'কে মেনে এসেছে হঠাৎ তারা দো-মনা করতে লাগল, যাবে, নাকি থাকবে!

ডাক শুনে 'ঝড়'-ও ফিরল; সে-ও বুঝল এইবার এইখানে একটা বোঝা-পড়া হবে।

সব হাতিরা সরে গিয়ে যুদ্ধের জন্য জায়গা করে দিল।

'মস্তান' আর 'ঝড়' দুজনে এগিয়ে এল।

কয়েকজন বেজায় সাহসী কাঠুরে সেই যুদ্ধ দেখেছিল। তারা-ই পরে গাঁয়ে গিয়ে খবর দিয়েছিল।

সে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বর্ণনা দেবার তাদের সাধ্য ছিল না।

অনেকক্ষণ ধরে নাকি যুদ্ধ হয়েছিল। যোদ্ধারা ছিল প্রায় সমান সমান! কি তাদের দাপট, কি তাদের গর্জন! বাকিরা শুধু দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

সেই যুদ্ধে দুজনার একটি করে দাঁত ভেঙেছিল, সারা গা রক্তাক্ত হয়েছিল। তবু তারা থামেনি।

শেষটা হঠাৎ যুদ্ধ থেমে গেছিল।

কেমন করে না জানি বুড়ো 'মস্তান' হাঁটু গেড়ে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। আর কিছুতেই উঠতে পারল না।

শত্রুকে বে-কায়দায় পেয়ে 'ঝড়' তেড়ে এসেছিল। কাঠুরেরা শিউরে উঠেছিল, এইবার বুঝি 'মস্তানে'র শেষ সময় এল।

কিন্তু গর্তের কিনারায় এসে 'ঝড়' থেমে গেল। তারপর আস্তে আস্তে ঘুরে নিজের পথ ধরল।

যে-বনে সে যেতে চেয়েছিল, সেই বনে চলে গেল 'ঝড়'। সঙ্গে গেল সারি সারি হাতি।

কয়েকটা বুড়ি হাতি আর তাদের বাচ্চারা কিন্তু গেল না। তারা ছায়ার মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

'মস্তান' চুপ করে পড়ে রইল।

আরো রাত হলে কাঠুরেরা ভয়ে ভয়ে গাছ থেকে নেমে গাঁয়ে ফিরে গেল।

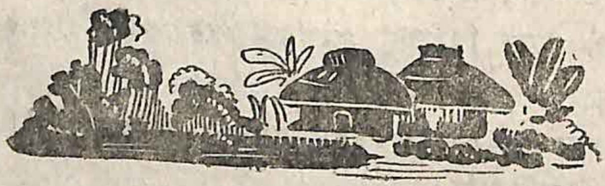
তিন-চার দিন বাদে সেই জায়গায় গিয়ে তারা কোনো হাতির দেখা পেল

এর পরের বছর ঝড়ের দল 'খেদায়' ধরা পড়েছিল।

হাতি ধরার ক্যাম্পকে 'খেদা' বলা হয়। বাংলার পুরনো নিয়মের খেদার লোকেরা ঐ সব হাতি ধরেছিল।

পরে তারা একটা অদ্ভুত কথা বলত। খেদায় ঘেরা হাতিগুলো যখন খুব দাপাদাপি করছিল, তখন বনের মধ্যে নাকি আরো কয়েকটা বুনো হাতি ব্যাকুল হয়ে ঘোরাঘুরি করছিল।

তাই শুনে গাঁয়ের লোকেরা বলাবলি করত ওরা যে 'মস্তান' আর তার বুড়ি হাতিরা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিজের হাতিদের রক্ষা করতে না পেরে মস্তানের নিশ্চয় বড্ড কষ্ট হচ্ছিল।



ঝড়

ছোটবেলায়, আমাদের দেশে তোলা একটা চলচ্চিত্রে দেখেছিলাম কেমন করে বুনো হাতি ধরতে হয়। সাজানো ছবি নয়, নীতীন বসু, মুকুল বসু, সেকালের নাম করা অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়াদের দেশে গিয়ে সত্যিকার খেদা থেকে ছবি তুলে এনেছিলেন। দেখলে যেমন মজা লাগে, তেমনি আবার গায়েও কাঁটা দেয়।

বুনো হাতির দলের সরদার মস্তানের ছেলে ঝড় আর তার দলের হাতিদেরো হয়তো ঐ নিয়মেই ধরা হয়েছিল। সে হল আমাদের বাংলার পুরনো নিয়ম।

কত শতাব্দী ধরে ঐ নিয়মে বুনো হাতি ধরা হচ্ছে কে জানে! যেমন ভালো নিয়ম, তেমনি খাটতেও হয় অনেক।

অনেক আগে থাকতে বন্দোবস্ত করতে হয়। এত লোকজন, জিনিসপত্রের দরকার হয়ে যে বড়লোক ছাড়া এ কাজ করতে পারত না। প্রমথেশ বড়ুয়ারা ছিলেন আসামের গৌরীপুরের বড় জমিদার, লোকে তাঁদের রাজা বলত। অনেক পুরুষ ধরে হয়তো তাঁদের লোকেরা হাতি ধরে ধরে হাত পাকিয়েছিল।

ঝড়ের দল-ও ছিল ঐ দিককার হাতি, তবে সে অনেক দিন পরের কথা। তার ছবি-ও কেউ তোলেনি।

হাতি ধরার এই নিয়মটি বড় ভালো।

যেখানে সেখানে হাতি ধরা যায় না। যেখানে বুনো হাতির বাস, সেই সব ঘন বনে যেতে হয়।

আগে একদল ওস্তাদ লোক গিয়ে খেদার জায়গা তৈরি করে। বনের মধ্যিখানে খেদা হলেই ভাল হয়। হাজার হাজার মজবুত গাছ সমান মাপে কেটে, আগার দিকটা ছুঁচলো করে নিতে হয়। খেদার জায়গায় অন্য গাছ থাকলে হবে না।

ছুঁচলো খুঁটিগুলো হাতির চাইতেও অনেকখানি উঁচু হওয়া চাই, যাতে ওপর দিয়ে দেখতে না পায়।

খুঁটিগুলোকে শক্ত করে গোল আকারে পুঁততে হবে। একটা বড় ফটক থাকবে সামনে, সেটি ওপর থেকে ঝাঁপ ফেলে বন্ধ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

দরজাটি আর খেদার দেওয়াল এমনি মজবুত করতে হবে, যাতে এক দল বুনো হাতি ঠেলে ভাঙতে না পারে।

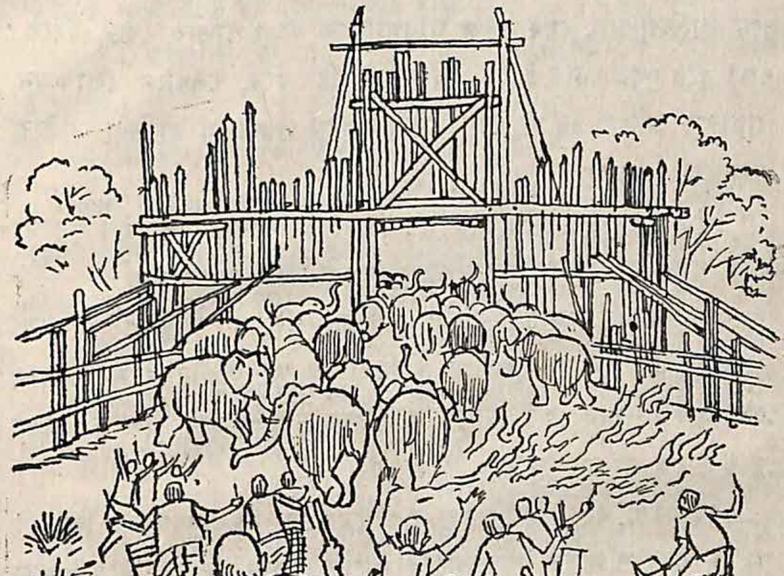
দরজার আর দেওয়ালের ভিতর দিকে বড় বড় কাঁটা থাকে, যাতে হাতিরা লাফ দিয়ে পড়ে, কিংবা মাথা দিয়ে ঢুঁ মেরে ভাঙবার চেষ্টা করলে, কাঁটার খোঁচা লাগে।

বাইরে থেকে আরো গাছের ঠেকা দিয়ে খেদার দেয়াল শক্ত করা হয়।

পাশে আরেকটা ছোট দরজা থাকে সেটিও ঝাঁপ দিয়ে বন্ধ করা হয়। সেই দরজা দিয়ে আরেকটা ছোট কিন্তু মজবুত ঘেরা জায়গায় যাওয়া যায়। ধরা পড়বার পর, সেই দরজা দিয়ে হাতিদের একে একে খালাস করে নেওয়া হয়।

এদিকে ঘেরা জায়গার বাইরেও অনেক আয়োজন করতে হয়।

বড় ফটকের বাইরে থেকে শুরু করে অনেক দূর অবধি একটা পথ তৈরি করা হয়, তার দুদিকে উঁচু বেড়া দেওয়া থাকে। এই পথটা ক্রমে খুব চওড়া হয়ে, তারপর শেষ হয়ে যায়।



বাইরের মুখটা খোলাই থাকে।

এতে-ও হল না।

সমস্ত বনটাকে 'পাত-বেড়' দেওয়া হয়। তার মানে যে জায়গায় বুনো হাতিরা চরে, সেই সমস্ত জায়গাটাকে লতা-পাতার বেড়া দিয়ে, একটু দূরে দূরে ছোট ছোট ছাউনি তৈরি করে, সেখানে লোকজন পাহারায় বসানো হয়। তাতে খেদার কাজ শুরু হলে হাতিরা বাইরে পালাতে পারে না।

পারলে হাতিরা ঘোর জঙ্গলের ভিতরেই খাবার খোঁজে। খেদা হচ্ছে, পাত-বেড় পড়ছে দেখে বনের আরো ভিতর দিকে যায়।

তারপর এক দিন ঢাক-ঢোল, পটকা, বাঁশি, ক্যানেস্তারা বাজিয়ে, এমনি ভয়ঙ্কর শব্দ করা হয় যে হাতিরা আরো গভীর বনে ঢুকবার চেষ্টা করে। যদি কেউ বাইরে পালাবার চেষ্টাও করে, বিকট তাড়া খেয়ে তাকে আবার ফিরে আসতে হয়।

এই সময়, বুনো হাতিদের সরদারের সে কি অবস্থা। কি যে করবে, বাচ্চাগুলোকে আর তাদের মাদের কোন দিকে নিয়ে গেলে বিপদের হাত থেকে বাঁচানো যায়, সে ভেবেই পায় না।

পথ আসলে ঐ একটাই, দুদিকে বেড়া দেওয়া সেই তৈরি করা পথ। সেটিতে একবার ঢুকলে আর বেরোনো যায় না।

খেদার লোকরা কাঠকুটো দিয়ে পিছনে আগুন ধরিয়ে দেয়। বনে জানোয়ার আগুনকে যেমন ভয় করে তেমন আর কিছুকেই নয়। কাজেই ওরা হুড়-মুড় করে সামনের দিকেই ছুটতে থাকে।

এদিকে পথটা ক্রমে সরু হতে হতে, শেষে একেবারে ফটকের সামনে গিয়ে পৌঁছয়।

ফটক হাঁ করে খোলা।

সব হাতি ভিতরে ঢুকলেই, কপি-কলের সাহায্যে ওপর থেকে দরজার ঝাঁপটা নামিয়ে দেওয়া হয়।

হাতিরা বন্দী হয়।

তখন তাদের রাগ দুঃখ দেখে কে! লোহার কাঁটা-বসানো দেয়ালে আছড়ে পড়ে পড়ে গা রক্তাক্ত হয়ে যায়।

তবু দেয়াল ভাঙে না। সঙ্গে সঙ্গে হাতিদের সে কি বিকট চ্যাচানি।

হাতির ডাককে বলে 'বৃংহণ'।

আরো অনেক পরে, লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে, চিৎকার করে, নিরাশায় যখন হাতিরা নেতিয়ে পড়ে, তখন পোষা হাতির সাহায্যে তাদের একে একে পাশের ছোট দরজা দিয়ে খালাস করা হয়।

ছোট জায়গাটা থেকে তাদের বাইরে আনা হয়।

কেউ কেউ পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু দড়ি, শেকল আর বেতের সঙ্গে পারবে কেন?

ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তাদের পা শিকল দিয়ে বাঁধলেও, ভালো ব্যবহার করা হয়, ভালো খেতে দেওয়া হয়। তা না হলে হাতি ক্ষেপে গেলে কে সামলাবে।

ক্রমে হাতিদের এই নতুন জীবন অভ্যাস হয়ে যায়। তখন তাদের কাজ শেখানো হয়। মাহুতের হুকুম মতো চলতে শেখানো হয়।

আগে গাছ কাটা, জাহাজে গাছের গুঁড়ি বোঝাই করা, এই সব কাজে হাতি লাগানো হত।

বড় লোকদের বাড়িতে হাতি পোষা হত, হাতির পিঠে চড়ে লোকে অন্য গ্রামে নেমন্তন্ন খেতে যেত।

এখন সে দিন গেছে। হাতির খাবার যোগাড় করাই মুশ্‌কিল। লরিতে, ট্রাকে আজকাল বেশির ভাগ কাজ হয়। কিন্তু এখনো যেখানে লরি, ট্রাক যাবার রাস্তা নেই, হাতি সেখানেও পথ করে নিতে পারে।

তাছাড়া পৃথিবীর সব দেশের চিড়িয়াখানার জন্য হাতির দরকার হয়।

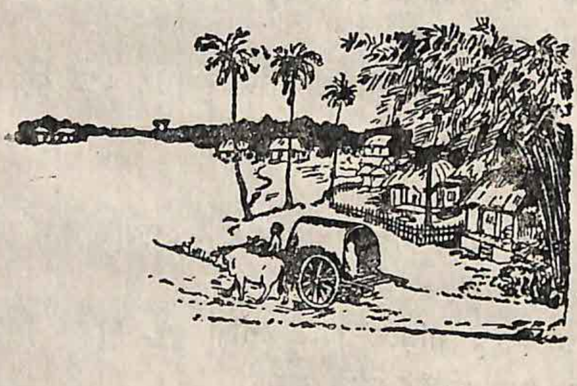
বাস্তবিক-ই এমন বিশাল, এত সুন্দর, এত বুদ্ধিমান, ফুর্তিবাজ জানোয়ার আর নেই। আর মানুষ কি না তাকেও হুকুমের চাকর বানাতে চায়!

'ঝড়ের' দলকেও এখন আর চিনবার উপায় নেই।

ঐ প্রকাণ্ড চমৎকার চেহারা, ঐ রকম দুচোখে মিটি-মিটি হাসি দেখতে কার না ভালো লাগে? 'ঝড়ে'র দলের হাতিরাও যেখানে যায়, সেখানেই আদর পায়।

কিন্তু বনের মধ্যে যে সুখ ভোগ করত, সে সুখ কি আর পায়?

—০—



হাতির ব্যাপার

সেকালে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের কথা শোনা যেত। ভারতবর্ষের পূব দিকের তিনটি রাজ্য। সেই বঙ্গ থেকে হয়েছে বাংলাদেশ আর আমাদের পশ্চিম-বাংলা ; কলিঙ্গ থেকে হয়েছে ওড়িষা। এই ওড়িষা একটি আশ্চর্য রাজ্য, যেমনি চমৎকার নদ-নদী, সমুদ্রতীর, তেমনি দামী ধাতুর আর পাথরের খনি আর এমন অপূর্ব সব বনভূমি, যার তুলনা খুঁজে পাওয়া দায়।

আগে ওড়িষাতে অনেক নাম-করা রাজা জমিদার ছিলেন। জানইতো জমিদারির নিয়ম উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জমিদাররা গেছে বটে, কিন্তু সেই সব অপরূপ বন-জঙ্গল, নদী, উপত্যকা আর সেখানকার অধিবাসী পশু-পাখিরা এখনো আছে।

তবে মানুষ বড় লোভী আর নিষ্ঠুর হয়। নিজেদের লাভের জন্য আর শিকারের লোভে তারা বাঘ-ভালুক তো বটেই, হাতি, গণ্ডার, কুমীর, আর কত রকম পাখিকে মেরে মেরে প্রায় শেষ করে এনেছে।

অনেক জাতের নির্দোষ হরিণকে অবধি বাদ দেয়নি। গাছ কেটে কেটে বনভূমি সাফ করে দিয়েছে।

প্রকৃতির এই সমস্ত ধনকে রক্ষা করবার জন্য আজকাল 'সংরক্ষিত বন' আর 'অভয়ারণ্যের' ব্যবস্থা হয়েছে।

এ বিষয়ে এর আগেও তোমরা শুনেছ। 'সংরক্ষিত' বনে অনুমতি ছাড়া কাউকে গাছপালা কাটতে, কিংবা ফুল-ফল তুলতে, বা জন্তু জানোয়ার মারতে দেওয়া হয় না। 'অভয়ারণ্য' কথাটার মানেই হল

যে বনে নির্ভয়ে জানোয়াররা থাকতে পারে।

বুঝতেই পারছ ওড়িষার বনেও এই রকম জায়গা আছে। তার মধ্যে একটি হল ময়ূরভঞ্জের কাছে।

এমন সুন্দর জায়গা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিশাল সব গাছ তাদের বয়স কত কে জানে! এ-সব গাছকে 'মহীরুহ' বলে, এরা গাছেদের ঠাকুর্দার মতো, কি মোটা গুঁড়ি তাদের! এদের কাটা কি ভাঙ্গা খুব সহজ কথা নয়।

বড় বড় গাছের মাঝে মাঝে হয়তো খানিকটা খোলা ঘাস-জমি, একটা ডোবা। এখানকার জমি সব জায়গায় সমান নয়, অনেক জায়গা উঁচু-নিচু পাহাড়ে।

এই অভয়ারণ্যে অন্যান্য জন্তুর সঙ্গে বড় বড় হাতিও আছে। অনেকে ভাবে বুনো জানোয়াররা বুঝি সব সময় মানুষ খুঁজে বেড়ায়, মারবে বলে। আসলে ঠিক তার উল্টো। এক যদি খেতে না পায়, তখন হাতিরা এসে ক্ষেত নষ্ট করে, বাঘেরা গ্রামের লোকের ওপর উৎপাত করে।

তাছাড়া দল থেকে খেদানো পাগলা হাতিও থাকতে পারে। নইলে সব জানোয়ার নিরিবিলি থাকার আশায় বন খোঁজে।

মানুষকে তারা সাধারণতঃ ভয় করে চলে।

অভয়ারণ্যে অনেক লোক কাজ করে। অনেক সিপাই আর পাহারাদার থাকে, শিকারীদের হাত থেকে জন্তুদের বাঁচাবার জন্য, জানোয়াররা ঠিক মতো খেতে পাচ্ছে কিনা দেখবার লোক থাকে। তাদের অসুখ-বিসুখ হলে, ওষুধপত্র দেবার জন্য ডাক্তারও থাকে। কাজের লোক ছাড়াও বাইরের বহু লোক বন-জঙ্গল, জন্তু-জনোয়ার দেখতে যায়।

তাদের জন্য থাকবার ঘর তৈরি করা হয় তার চারিদিকে অনেক সময়েই বেড়া দেওয়া থাকে।



হয়তো যে জলাশয়ে জানোয়াররা জল খেতে আসে, তার কাছে তিন তলার সমান উঁচু কাঠের কিংবা মজবুত ইটের থামের ওপর চারিদিকে বারান্দা দেওয়া ঘর করে দেওয়া হয়। সেখানে বসে জানোয়ারদের যাওয়া-আসা দেখা যায়।

ময়ুরভঞ্জের ঐ বন দেখবার জন্যেও অনেক লোকের বড় ইচ্ছা। শেষ পর্যন্ত বন-বিভাগ থেকে ঠিক হল যে দর্শকদের থাকবার জন্য, আর দেখবার জন্য থামের ওপর ঘর হবে।

তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেল, ইঁট কাঠ চুন সুরকি এল। দলে দলে মিস্তিরি মজুর এল। গাছ, কেটে, মাটি সমান করে জমি তৈরি হতে লাগল।

এদিকে হাতির দল ব্যাপার দেখে রেগে টং। তাদের চরে বেড়াবার জায়গায় এ সব কিসের উৎপাত!

বাড়ি খানিক দূর উঠলে রাতারাতি ওরা ভেঙে দিয়ে গেল। কিছু বাকি রাখল না, মাড়িয়ে মাড়িয়ে সব একাকার করে দিয়ে গেল।

কিন্তু বন-বিভাগই বা ছাড়বে কেন? পাহারা বসানো হল, বাড়িও তৈরি হল।

শুধু তাই নয়। মোটা মোটা গাছের গুঁড়ির ওপর উঁচু করে ঐ বাড়ি হল। তাতে নানা রকম আসবাব এনে তোলা হল। দূর থেকে হাতির দল সব দেখল।

তারপর একদিন কাজ শেষ করে, লোকজনও সব চলে গেল। রইল শুধু বন বিভাগে যারা কাজ করে। তখনো বাইরের লোক কাউকে সেখানে আসতে দেওয়া হয়নি।

এমন সময় একদিন রাতে দলবলে ছানা বাচ্চা নিয়ে হাতিরা এসে হাজির হল।

সব দেখেশুনে তারা হক্‌চকিয়ে গেল। এ আবার কি? মোটা মোটা গাছের গুঁড়ির ঠ্যাঙের ওপর বাড়ি!

এ গুঁড়ি তো মাথা দিয়ে ঠেলে কোন কালেও ভাঙা যাবে না। ওপরে উঠবার জন্য খাঁজকাটা গাছের গুঁড়ি লাগানো রয়েছে।

বড় হাতিরা বড় সাবধানী হয়। পা দিয়ে প্রথমেই তারা গাছের গুঁড়ির সিঁড়ি পরখ করে দেখল। বড় হাতি উঠতে পারবে না, সিঁড়ি বড় হাল্‌কা।

বড় হাতি না পারুক, ছোট হাতিরা তো পারবে।

তখন বাচ্চা হাতিদের একে একে শুঁড় দিয়ে ঠেলেঠুলে ঐ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে তুলে দেওয়া হল। ওপরে গিয়ে কি করতে হবে সে আর বলে দিতে হল না।

বড়রা নিচে দাঁড়িয়ে থাকল আর ছোটরা মনের আনন্দে ঘরের যা কিছু জিনিস-পত্র, সব ভেঙ্গে তচ্‌নচ্‌ করে দিতে লাগল। তারপর সব গুঁড়ো হয়ে গেল, নিচে নামবার জন্য তারা আবার সিঁড়ির কাছে এল। কিন্তু কি সর্বনাশ! উঠবার সময় অত টের না পেলেও, নামবার সময় দেখা গেল সিঁড়ি নড়বড় করে, পা রাখবার জায়গা নেই! বাচ্চা হাতিরা মহা চ্যাঁচাতে লাগল।

তার পরের ব্যাপার আরো অদ্ভুত।

বড়রা তখন এগিয়ে এল। একজন মাটিতে বসল, তার পিঠে আরেকজন উঠে বসল, তার পিঠে আরেকজন। কয়েকজন উঠতেই দিব্যি এক হাতির সিঁড়ি তৈরি হয়ে গেল।

বাচ্চাদের তখন পায় কে! দিব্যি সুন্দর বাপ জ্যাঠাদের গা বেয়ে তারা নেমে এল।

তারপর বড় হাতিরা একে একে ওপর থেকে নেমে এল। তারপর দল বেঁধে নিঃশব্দে তারা গভীর বনে ফিরে গেল।

ভয়ে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে দূর থেকে যে পাহারাদাররা এই ব্যাপার দেখেছিল, তারা একেবারে তাজ্জব বনে গেল।

পরে এই ঘটনার কথা খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল।

সুখীদের বন

ছোটবেলায় একটা ইংরিজি বই থেকে আমার মা একটা চমৎকার হাতির গল্প বলেছিলেন। তার অনেকখানি ভুলেও গেছি। সে আজ প্রায় ষাট্ বছর আগের কথা। আফ্রিকার গল্প। সেকালে আফ্রিকাও ভারতের মতো পরাধীন ছিল। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, বেলজিয়াম, ইটালিয়ান ইত্যাদি মিলে ও দেশের প্রায় সবটাই ভাগাভাগি করে দখল করে রেখেছিল।

সে কি দেশ! আশ্চর্য সুন্দর গাছপালা, বিশাল নদী, আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়, ধূ-ধূ মরুভূমি তো ছিলই; তার ওপর এমন সব জন্তু-জানোয়ার ছিল, যা পৃথিবীর খুব কম দেশেই দেখা যায়। নানা জাতের হরিণ, গণ্ডার, সিংহ, জিরাফ, পাখি, উট-পাখি, বাঁদর, আর হাতি। আফ্রিকার হাতির কথা পৃথিবীতে কে না জানত।

এই আফ্রিকাতে বহু ইংরেজ সেকালে খেত-খামার চাষ-বাস করে জীবন কাটাত। অনেকে ওখানকার বাসিন্দাই হয়ে যেত। বাপের পর ছেলে, তারপর নাতি, তারপর তার ছেলে। এই ভাবে ক্রমে দেশের সঙ্গে সম্বন্ধটা কমে গিয়ে, ওরা আফ্রিকাবাসী হয়ে যেত। ইংরিজি হাল-চালে দিন কাটলেও, ওরা ও দেশের ভাষাও শিখত।

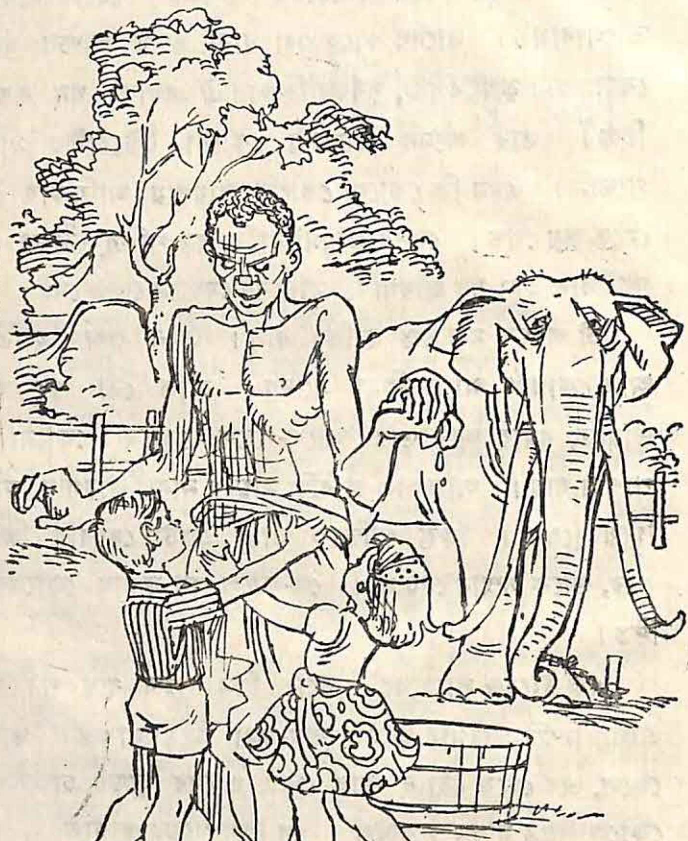
ওদের ছেলে-মেয়েরা চাকর-বাকরদের সঙ্গে ঐ দেশের ভাষায় গল্প করত।

চাকর-বাকররা ভারি বিশ্বাসী ছিল। প্রভুর জন্য তারা প্রাণ দিতে পারত। প্রভুর ছেলে-মেয়েদের নিজের ছেলে-মেয়ের মতো ভালোবাসত। তাদের কাছে ওরা নানা রকম আশ্চর্য গল্প শুনত। যেখানকার কথা বলছি, পূর্ব আফ্রিকার ঐ এলাকা ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। তার অনেক জায়গায় কোনো ইউরোপীয় মানুষের পা পড়েনি। এমন কি কোনো কোনো জায়গায় আফ্রিকার লোকেরাও যেতে ভয় পেত। সেসব জায়গা নাকি বড় পবিত্র, ঠাকুর দেবতাদের আশীর্বাদ করা সব জায়গা। মানুষের যেখানে যেতে নেই।

ঐ অঞ্চলে মস্ত মস্ত হাতির বাস। এমন সুন্দর হাতি পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ! হাতি তো শুধু আফ্রিকায়, ভারতে, বর্মায় আর তার আশে-পাশে কোনো কোনো জায়গায় পাওয়া যায়। আজকাল অবিশ্যি মানুষে নানা জায়গায় হাতি নিয়ে গিয়ে পুষেছে। কিন্তু হাতিকে তারা একটা দেখবার জিনিস মনে করে, তাকে সম্মান দেয় না। সে-কালে আফ্রিকার লোকেরা যেমন দিত।

এক ইংরেজ সাহেবের পরিবার তিন পুরুষ ধরে পূর্ব আফ্রিকার একটা নির্জন জায়গায় অনেক জমি-জমা নিয়ে থাকত। তাদের এক ছেলে, এক মেয়ে টোবি আর মেরি তাদের বুড়ো চাকর ওমাহোর কোলে পিঠে মানুষ হয়েছিল। সে ছিল গল্পের জাহাজ।

আগে ওমাহো সাহেবের সঙ্গে সিংহ শিকারে যেত; হাতি-ধরার সাফারিতে যেত; ভারি জোর জবরদস্ত মানুষ ছিল সে। পরে সাহেবের হাতিদের দেখাশুনো করত। সাহেবের হাতিদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে প্রকাণ্ড, সবচেয়ে জোরালো, সবচেয়ে সাহসী, তার নাম ছিল বাদশা। ওমাহো বলত বাদশার নাকি একশো বছরের বেশি



বয়স। ওমাহোর ঠাকুরদা সাহেবের ঠাকুরদার জন্য ওকে ধরেছিল। তখন হাতিটার হয়তো চার-পাঁচ বছর বয়স। তার পর একশো বছরের বেশি কেটে গেছে।

বাদশা আজকাল বুড়ো হয়েছে। পায়ের জোর কমে গেছে। বড় গাছে আর পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। গাছের গুঁড়ি মচ-মচ করে। তেমনি ভারি বুড়ো বাদশার প্রকাণ্ড দুই দাঁত। সাদা, চকচকে, কোথাও এতটুকু দাগ বা খুঁৎ নেই। অনেক হাজার টাকা দাম ঐ দাঁতের। সাহেবকে বন্ধুরা দাঁত কাটার কথা বললে, সাহেব রেগে যেতেন। বলতেন, "টাকা দিয়ে বাদশার দাঁতের দাম হয় না।"

এখন বাদশাও বুড়ো হয়েছে। সাহেবের কাঠের ব্যবসায় পর পর দু-বছর বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। হাতির দাঁতের দামও পাঁচ-গুণ বেড়েছে। রাতে খেতে বসে সাহেবের বন্ধু বুথ সাহেব সেই কথাই বলছিলেন। সাহেবেরো খানিকটা মত আছে মনে হল।

খাবার সময় ওমাহো দেখাশুনো করত। কানে কথাটা যেতেই সে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। পরদিন সকালে টোবি মেরি দেখল ওমাহো বাদশার পায়ের নখ, কানের ভিতরটা, দাঁতের গোড়া খুব ভালো করে ধুচ্ছে, সাফ করেছে। টোবি মেরি বলল, "ও কি কোথাও যাবে? ওকে সাজাচ্ছ কেন?"

ওমাহো বলল, "ও সুখীদের বনে যাবে।"

টোবি মেরি তো অবাক! "সুখীদের বন? সে আবার কোথায়?"

ওমাহো বলল, "সাহেবদের সে কথা বললে, বনটা আর সুখী থাকবে না।"

টোবি মেরি বলল, "আমরা তো আফ্রিকায় জন্মেছি, আমাদের বল।"

ওমাহো বাদশার হাঁটু ঘষতে ঘষতে বলল, "কেউ কখনো মরা বুনো হাতি দেখেনি কেন জান? যাদের সাহেবরা পোষে, কিম্বা বনে গিয়ে গুলি করে মারে, তাদের মরা শরীর পাহাড়ের মতো মাসের পর মাস পড়ে থাকে। শুধু দাঁতগুলো সাহেবরা নিয়ে যায়। দাঁতের জন্য অত বড় দেবতাটাকে মেরে ফেলে। কিন্তু বনের হাতির মরা শরীর কেউ দেখতে পায় না।"

টোবি জিজ্ঞাসা করল, "মরা বুনো হাতি কেউ দেখতে পায় না কেন?"

ওমাহো বলল, "যখন হাতি খুব বুড়ো হয় সে টের পায় তার যাবার সময় হয়েছে। তখন সে শেষবারের মতো তার ভালবাসার জায়গাগুলোকে একবার ঘুরে চোখ ভরে দেখে নেয়। তারপর পাহাড়ের মাঝখানে গভীর বনের দিকে চলে যায়। বনের একেবারে মধ্যিখানে, যেখানে সব হাতি-চলার পথ এক হয়েছে, যেখানে ঝড় পৌঁছয় নিশ্বাসের মতো, বৃষ্টি পড়ে আদরের মতো, সেইখানে সুখীদের বন। বাদশার মা-বাবা, তার মা-বাবা তার মা-বাবা, হাজার হাজার বছর ধরে সেইখানে গিয়ে ঘুমিয়েছে। বাদশাও সেখানে চলে যাবে, তার লাখ টাকা দামের দাঁত নিয়ে।"

টোবি মেরি কেঁদে বলল, "আমরাও যাব সেখানে। বাদশার যদি একলা লাগে?"

ওমাহো হাসতে লাগল। "সাহেবের ছেলে-মেয়েরা সেখানে গেলে বাঁচে না, বেরিরা। তাছাড়া সেখানে যাবার পথ সাহেবরা একবার জানতে পারলে বড় বড় গাড়ি নিয়ে গিয়ে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে কোটি কোটি টাকার হাতির দাঁত নিয়ে আসবে। বাদশার একা লাগবে না। সুখীদের বনের চারদিকে যে উঁচু পাহাড়ের দেয়াল, আমি সেই পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দেব। সেখানে তো ওর মা বাবা ঠাকুরদা ঠাকুমা সবাই আছে। ভিতরে যাবার আমারো হুকুম

নেই।"

মেরি বলল, "তারপর তুমি কোথায় যাবে?"

"ঐ যেখানে কিলিমাঞ্জারোর চূড়োর বরফ আর সাদা মেঘ এক হয়েছে, ওর-ই নিচে আমাদের গ্রাম। ঐখানে আমরা গিয়ে মাটি নিই। আমারো নব্বুই বছর বয়স হয়েছে।"

ছোট ছোট হাত দিয়ে ওরা ওমাহোকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তোমরা চলে গেলে আমাদের কষ্ট হবে।"

ওমাহো উঠে পড়ে বলল, "না গেলে রবিবার বুথ সাহেব এসে দো-নলা বন্দুক দিয়ে বাদশাকে মেরে ফেলবে। ওর দাঁতের জন্য তোমাদের বাবা অনেক টাকা পাবে।"

টোবি মেরি বলল, "বাবা ওকে ভালোবাসে, কখনো মারবে না।" ওমাহো বলল, "না মারলেও করাৎ দিয়ে ওরা দাঁত কেটে নেবে। কাটা দাঁত নিয়ে ও কি করে সুখীদের বনে যাবে? হাসি মুখে বিদায় দাও।"

পরদিন সকালে যখন সকলে এসে বলল, বাদশাকে আর ওমাহোকে পাওয়া যাচ্ছে না, টোবি মেরির বাবা চুপ করে রইলেন। আরো বেলায় বুথ সাহেব এসে বললেন, "ভারি বজ্জাৎ তো ঐ ওমাহো। দাঁতের লোভে বুড়ো হাতি নিয়ে ভেগেছে! বলতো এক্ষুনি পুলিশ-পেয়াদা লাগিয়ে ধরে আনি। কতদূর আর গেছে বুড়ো হাতি।" টোবি মেরির বাবা বললেন, "না যাক। আর দেখ বুথ, ওমাহের পেটে খিদে থাকলেও মনে লোভ নেই। সে তুমি বুঝবে না।"

সে-দিন রাতে খাটে শুয়ে কেঁদে কেঁদে টোবি মেরি যখন প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন ওদের মা-বাবা এসে পাশে বসে ওদের আদর করলেন। বাবা বললেন, "বাদশা সুখীদের বনে গেছে। কাঁদতে হয় না।"

টোবি আর মেরি অবাক হয়ে বলল, "তুমি কি করে জানলে, বাবা? সাহেবদের ও-কথা বলতে হয় না? তারা বড় লোভী।"

বাবা বললেন, "প্রায় চল্লিশ বছর আগে ওমাহোর বাবা আমাকে সুখীদের বনের কথা বলেছিল। বলেছিল বাদশার যখন সময় হবে কেউ ওকে বাধা দিও না। সে-কথা আমি ভুলেই গেছিলাম। আজ মনে পড়ল।"

মেরি দু-হাত জোড় করে বলল, "সুখীদের বনে ভগবান থাকেন। তিনি ওদের দেখেন।



সাদা হাতি

এখন যেমন বড়লোকেরা বড় বড় মোটর-গাড়ি কিনে সবাইকে দেখায় তাদের কত টাকা, সেকালে তেমনি রাজারাজড়াদের চমৎকার সাজ-পরা মস্ত মস্ত হাতির শোভাযাত্রা দেখে বোঝা যেত রাজার কত ধন মান। রাজা যখন হাতির পিঠে সোনার হাওদায় চড়ে রাজ্য দেখতে বেরুতেন, প্রজারা দূর থেকে তাঁর দিকে ফুলের মালা ছুঁড়ে ফেলত আর দু-হাত জোড় করে নমস্কার করত। তাদের কাছে রাজা ছিলেন দেবতার সমান। ইচ্ছা হলে রাখবেন, না হয় কেটে ফেলবেন। আর ঐ হাতি ছিল রাজার ক্ষমতার চিহ্ন। প্রজাদের দেওয়া ফুলের মালা সে পা দিয়ে মাড়িয়ে যেত।

হাতির মতো জানোয়ার কম আছে। পোষ মানে, অথচ তার জোরের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না। যেমন সুন্দর, তেমনি ভয়ানক। যেমন রাজা, তাঁর তেমনি বাহনটি-ও তো হওয়া চাই। বাঘ, সিংহ ছাড়া এমন সুন্দর, এমন ভয়ঙ্কর জানোয়ার আর কোথায় আছে? কিন্তু বাঘ সিংহ তো আর হাতির মতো মানুষের ঘরে বাস করে না। তাদের দেখতে হলে হয় খাঁচায় বন্ধ করে দেখতে হয়, নয় ঘোর বনে যেতে হয়। আর হাতি দেখা যায় যখন-তখন শহরের পথে-ঘাটে।

লোকে হাতি দেখত; হাতির পিঠে সোনার হাওদায়-বসা রাজা, রাণী, রাজপুত্র দেখত। কিন্তু হাতির গলার ওপর বসা রোগা-পট্‌কা লোকটার ওপর কারো বড় একটা চোখ পড়ত না। অথচ হাতির কাছে রাজা কিছু না, ওর ঘাড়ে বসা খুদে মাহুতই সব। হাতির পিঠে বসা রাজার কথায় যেমন প্রজারা ওঠ্-বস্ করত, তেমনি মাহুত মুখ দিয়ে একটু শব্দ করতেই হাতি ওঠ্-বস্ করত। পিঠের ওপর রাজা-রাণী থাকলেও করত।

দক্ষিণ-ভারতের এক দেশ। সেখানে উৎসবের দিনে রাজা-রাজড়াদের হাতিরা শোভা-যাত্রা করে এক মন্দির থেকে দেবতাকে নিয়ে আরেক মন্দিরে যেত। আবার পূজোর পর তাঁকে ফিরিয়ে আনত। সব চাইতে বড়, সব চাইতে ভালো হাতির পিঠে দেবতা যেতেন।

সব চাইতে বড় আর ভালো হাতির নাম ছিল শমন। সে ছিল রাজার হাতিশালের সব চাইতে ভালো হাতি। তাকে বর্মার এক রাজা উপহার পাঠিয়েছিলেন। শমনের গায়ের রঙ অন্য হাতিদের মতো ছিল না। অনেকটা ফিকে, প্রায় সাদা। বর্মার রাজা বলে পাঠিয়েছিলেন ওর পিঠে যেন রাজা, রাজপুত্র আর রাজার নিজের মাহুত ছাড়া কেউ না চড়ে। রাণীও না। তবে দেবতার কথা আলাদা। তিনি রাজার-ও ওপরে। প্রতি বছর শমনের পিঠে চড়ে দেবতা বেরোতেন। শমনের মাহুতের জীবনে সেটি ছিল বড় গর্বের, বড় আনন্দের দিন। রাজা তার পিছনে অন্য হাতি চড়ে শোভাযাত্রায় যেতেন।

শমনের মাহুতের নাম সুবায়া। তার সব ভালো, শুধু একটি দোষ, মাঝে মাঝে সে নেশা করত। সেবারের উৎসবের আগের রাতে বন্ধুবান্ধবের দলে পড়ে নেশা করে, ভোরে সুবায়া হাতিশালে এল না।

এদিকে মন্দিরের সময় বয়ে যায় দেখে রাজার হুকুমে ছোট মাহুত

শম্ভু শমনকে সাজাল-গোজাল। তারপর শোভাযাত্রার মাথায় দাঁড় করাল। তারপর সুবায়ার জায়গায় নিজে বসল।

বসল বটে, কিন্তু ও হাতির গায়ে সুবায়া ছাড়া কেউ কখনো হাত দেয় নি। বর্মা থেকে সুবায়াই ওর সঙ্গে এসেছিল। লোকে বলত ও হাতি আর সুবায়া আলাদা নয়। এখন অন্য লোক ওর ঘাড়ে চেপে, ওর কানের পেছনে পা ঠেকাতেই, হাতির মেজাজ গেল বিগড়ে।

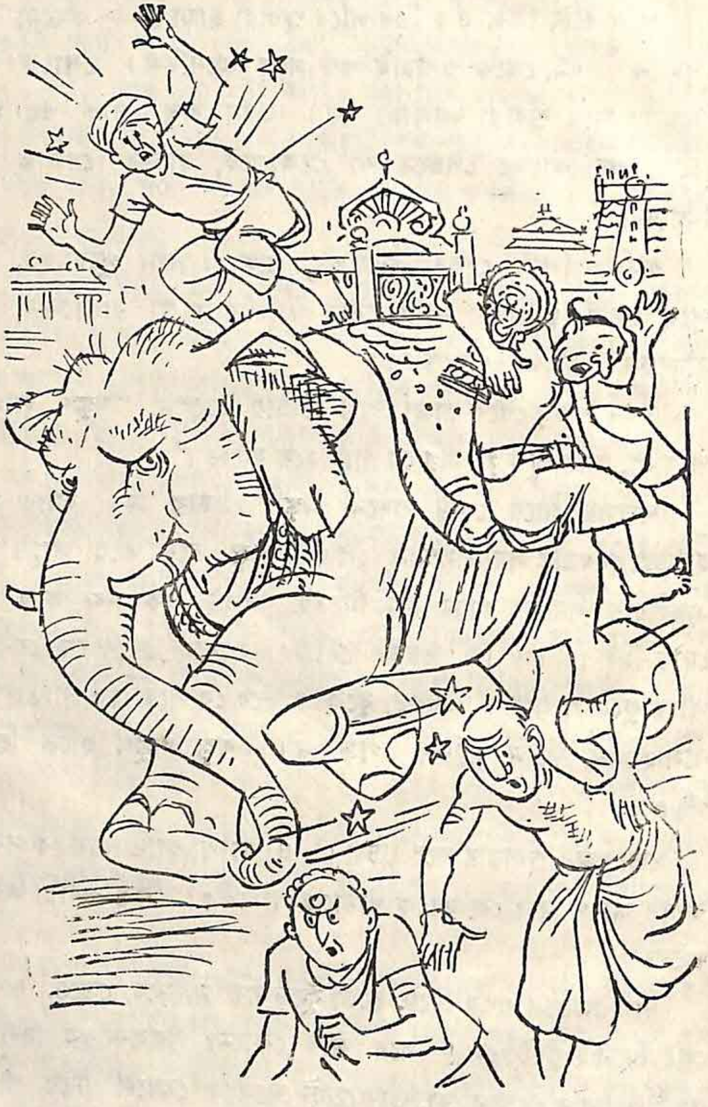
হাতির পিঠে দেবতা উঠেছেন, সঙ্গে একজন পুরোহিত, অন্য পুরোহিতরা দু-পাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজাচ্ছেন, ঘণ্টা নাড়ছেন। হাতি তবু নড়ে না।

তখন পিছন থেকে রাজা রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, "অঙ্কুশ লাগাতে পার না, আহাম্মুক? লগ্ন যে পার হয়ে যাচ্ছে।"

শমনের গায়ে কেউ কখনো অঙ্কুশ ঠেকায় নি। বর্মার সাদা হাতিরা দেবতার সমান সম্মান পেত। শম্ভু ভয়ে ভয়ে অঙ্কুশ নিয়ে একটিবার শমনের কানে টান দিতেই, বিকট এক শব্দ করে শমন দৌড় দিল। সে কি ভয়ঙ্কর দৌড়! সামনে থেকে যে যে-দিকে পারে ছুটে পালাল। দেবতা বুকে জড়িয়ে যে পুরোহিত হাতির পিঠে বসেছিলেন, তিনি গড়িয়ে পড়লেন। শম্ভু অঙ্কুশ হাতে ছিটকে পড়ল।

লোকজন সুবায়ার ঘরে ছুটল। ও খ্যাপা হাতি কার কি সর্বনাশ করার আগে আর কে তাকে থামাতে পারবে? কিন্তু সুবায়া অজ্ঞান, অচৈতন্য।

ধান-ক্ষেতের ওপর দিয়ে, দুটো কুঁড়ে ঘর মাড়িয়ে ভেঙে, শমন-ও সেই দিকেই ছুটে এল! ঘরে আর কোনো পুরুষ-মানুষ ছিল না। তখন সুবায়ার ছেলের বৌ, তার ছোট্ট ছেলেকে কোলে নিয়ে শমনের সামনে দাঁড়াল। সবার হায় হায় করে উঠল।



তাদের দেখে শমন থমকে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। তারপর শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে দুজনকে মাথার উপর তুলে নিয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল। ক্রমে তার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এল। ও তো আর সাধারণ হাতি ছিল না।

ততক্ষণে সুবায়ার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে তাকে সুস্থ করে তোলা হয়েছিল। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সুবায়া এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। ভাবল এর পর তার আর বেঁচে থেকে কি লাভ? সেদিন পুরোহিত নিজের মাথায় করে দেবতাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে রাজবাড়ীতে সুবায়ার ডাক পড়ল। সুবায়া রাজার পায়ে পড়ল।

রাজা বললেন, "তুমি আমি দু-জনে আজ দেবতার অসম্মান করেছি। তুমি এমন দিনে নেশা করে পড়েছিলে আর আমার এত অহঙ্কার যে সাদা হাতিকে অঙ্কুশ লাগাবার হুকুম দিয়েছিলাম। এসো দু-জনে হাত জোড় করে দেবতার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসি।"

শমন তাঁদের মন্দিরে নিয়ে গেল।



অনেকদিনের হাতি

আজকাল শোনা যায় হাতির বাস নাকি শুধু আফ্রিকায়, ভারতে, বর্মায় আর তার আশে পাশে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে দক্ষিণ অ্যামেরিকার খুব পুরনো মন্দিরের গায়ে অন্যান্য জানোয়ারের সঙ্গে হাতির নক্সাও আছে। উত্তর বা দক্ষিণ অ্যামেরিকার কোথাও কোনো কালে হাতি থাকার কোনো চিহ্ন নেই। তাহলে মন্দিরের গায়ে কে হাতি আঁকল ?

এর একটা কারণ হতে পারে যে সেকালে ওখানে হাতি ছিল, যদিও মাটি খুঁড়ে তার হাড়গোড় পাওয়া যায়নি। নয়তে আফ্রিকা থেকে কেউ হাতি দেখে এসে নক্সা করেছে। সেকালে 'বাল্‌সা' বলে এক রকম হাল্কা গাছের নৌকা করে, মিশর দেশের লোকরা নাকি সমুদ্র পার হয়ে দূর দেশে যেত।

আরেকটা কারণ হতে পারে রাশিয়া কিম্বা সাইবিরিয়ার উত্তর দিকে যেখানে প্রায় সারা বছর সব কিছু বরফে ঢাকা থাকে, সেখান থেকে সেকালে কোনো ভ্রমণকারী উত্তর অ্যামেরিকা হয়ে দক্ষিণে গিয়ে, হাতির গল্প করেছিল, ছবি এঁকেছিল। ম্যাপে দেখা যায় একটা জায়গায় সাইবিরিয়ার একটা কোণা আর আলাস্কার একটা কোণা খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। বেরিং প্রণালী পার হয়ে দিব্যি চলে যাওয়া যায়।

সেকালে ইউরোপের উত্তরের অনেক জায়গায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দাঁত-ওয়ালা লোমশ হাতি ঘুরে বেড়াত। অনেক পুরনো গুহার দেয়ালে সেকালের মানুষদের আঁকা লোমশ হাতির ছবি দেখা গেছে।

এ গল্পটা-ও ঐ জায়গার তিনজন নাবিকের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার বিষয়। ইউরোপ আর এশিয়ার উত্তরে ঐ সব বরফ ঢাকা জায়গার আশে পাশে সমুদ্রে নানা জাতের, ছোট বড়, চমৎকার মাছ পাওয়া যায়। জলে ঝড়ে শীতে মাঝিরা দল বেঁধে মাছ ধরতে যায়। অনেক পরিবার অনেক পুরুষ ধরে ঐ কাজ-ই করে আসছে। সমস্ত পৃথিবীর লোক সেই মাছ অনেক দাম দিয়ে কেনে। তাতে অনেক লাভ হয়; কিন্তু সর্বদা প্রাণ হাতে করে বেড়াতে হয়।

একবার একটা ছোট মোটর বোটে তিনজন রুশ নাবিক বড় জাহাজ থেকে নেমে ভেসে পড়ল। ভাবল দিব্যি পরিষ্কার দিন, জায়গাটা একটু দেখা যাক। হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠে কোথায় যে তাদের ঠেলে নিয়ে গেল, তারা ভেবেই পেল না। নৌকো আছড়ে ডাঙায় পড়ে দেখতে দেখতে চুরমার। ঝড় যখন থামল, ওরা একেবারে তাজ্জব বনে গেল। সঙ্গে খাবার নেই, জল নেই, নৌকোর সঙ্গে সব গেছে। গায়ে অবশ্যি বরফের দেশের যোগ্য মাথা-ঢাকা মোটা পোষাক, পায়ে বরফে হাঁটার যোগ্য বুট, তাই বেঁচে গেল।

কিন্তু সে কি আবহাওয়া, না-দিন, না-রাত। সব লেপে-পুঁছে একাকার। তখন ওখানে শীত কমে এলেও হাড়-কাঁপানো ব্যাপার। তারা না দেখতে পেল কোনো মানুষের বাড়ি, না দেখল গাছপালা। খালি কয়েকটা ঝোপ-ঝাপ।

এমন সময় আধো অন্ধকারের রঙ আরো কালো হল। মনে হল বোধ হয় রাত নামল। হাঁটছে তো হাঁটছেই ওরা। না হাঁটলে ত জমে যাবে। সোজা হাঁটছে, নাকি গোল হয়ে এক-ই জায়গায়



ঘুরছে তাও টের পাচ্ছে না। হঠাৎ এক চিৎকার দিয়ে সবার আগে যে ছিল সে বরফের নিচে তলিয়ে গেল।

"কি হল, কি হল?" করে অন্য দু-জন ছুটে আসতে, তারাও বরফের মধ্যে একটা গর্তের ভিতর দিয়ে পড়ে গেল। গাদাগাদি করে এ-ওর পিঠের ওপর বেশ তিন-তলার সমান গর্তে পড়ল তিনজন। পড়েই অচেতন। অনেক পরে যখন আবার জ্ঞান হল, আগেই তাদের মনে হল এবার তাহলে জ্যান্ত কবর হল। এই তিন-তলার সমান গর্ত থেকে বেরুবার তো কোনো উপায় নেই। তা ছাড়া বেরুলেও যাবেই বা কোথায়? তার চেয়ে এখানে পড়ে থাকাই ভালো। বেশ গরম জায়গাটা। অন্ধকার, কিন্তু একেবারে অন্ধকার না। একটু ধোঁয়া ধোঁয়া।

হঠাৎ ওরা একটু সজাগ হয়ে উঠল। ধোঁয়া কেন হবে? আলো কিসের? ওরা কি মরে গেছে? গর্ত পানা এই জায়গাই স্বর্গ নাকি? নড়তে গেলেই সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা লাগল। তিন-তলা থেকে পড়া তো সোজা কথা নয়! আবার হয়তো জ্ঞান হারিয়ে থাকবে। মনে হল কারা যেন নরম হাতে বুট-জুতো খুলে দিচ্ছে, পায়ে গরম জলের সেঁক দিচ্ছে। মুখে নরম নরম কিসের মাংস পুরে দিচ্ছে। একটু আঁশটে, একটু ওষুধ ওষুধ গন্ধ হলেও, খেয়ে যেন দেহে প্রাণ এল। এ স্বর্গ না হয়ে যায় না! স্বর্গ ছাড়া আর কোথায় অচেনা লোক এত যত্ন পায়?

আস্তে আস্তে শরীরের ব্যথাগুলো কমতে লাগল; হাতে পায়ে জোর এল; বরফ-লাগা চোখে দৃষ্টি ফিরে এল। তারপর একদিন চোখ খুলে দেখে কাছে বরফের চাকতিতে একটা শুকনো কাঠের মশাল গোঁজা। তার আলোয় দেখতে পেল, এক পাশে একটা গরম জলের ঝরণা। এরই জলে তাহলে কেউ গায়ে পায়ে সেঁক দিয়ে ওদের সারিয়ে তুলেছে। গর্তটাও নিশ্চয় বাতাস আসার গর্ত।

তারপর আধা অন্ধকারে যখন চোখ আরো সয়ে এল, অন্য দিকে পাশ ফিরেই তিনজনে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। প্রায় দোতলার সমান উঁচু, প্রকাণ্ড তুই দাঁত-ওয়ালা একটা হাতি প্রায় ওদের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। এর আগে ওরা হাতির ছবি দেখেছিল, হাতি দেখেনি। ছবির হাতি অন্য রকম ছিল, এত বড়-ও নয়, গায়ে এত লোম-ও ছিল না। হাতিটা কিন্তু নড়ল না।

ওদের চিৎকার শুনে আট-দশ জন লোমের পোষাক-পরা লোক ছুটে এল। "কি হল? কি হল?" ওদের ভাষা নাবিকরা বুঝতে পারল। বেরিং প্রণালীর ওদিক্‌কার লোকদের ভাষা। নাবিকদের মধ্যে সব চেয়ে বড় যে, সে হাতিটাকে দেখিয়ে দিল। ওরা হাসতে লাগল। "দেখ, দেখ, ওটা বরফে-জমা হাতি। তু-হাজার বছরের পুরানো। বরফে কিছু নষ্ট হয় না। সেকালে এই রকম হাতি এখানে ঘুরে বেড়াত। হয়তো বরফে ধ্বস নেমে এ তুটো হাতি জ্যান্ত চাপা পড়েছিল।"

নাবিকরা বলল, "কি সাংঘাতিক! এত বড় জানোয়ার অমনি জ্যান্ত মরে গেল! অন্যটা কোথায়?"

লোকগুলি হাসতে লাগল, "মরেছিল বলেই তো আমরা এতগুলো লোক সারা শীতকাল বাঁচলাম। তোমরাও বাঁচলে।"

"সে কি রকম?"

"কি রকম বলব? এত দিন কি খেয়ে বাঁচলে? সেই তু-হাজার বছরের পুরনো অন্য হাতিটার মাংস ছাড়া কিছু নয়। এবার শীতকালটা বড় বেশি দিন চলেছিল। আমাদের সব রসদ ফুরিয়ে গেছিল। এটা আমাদের শীতকালের আস্তানা। ওরা আমাদের পাহারাওয়ালা ছিল। তাদের একজনকে আমরা শেষ করে এনেছি।" মনে হল ওদের কান্না পাচ্ছে।

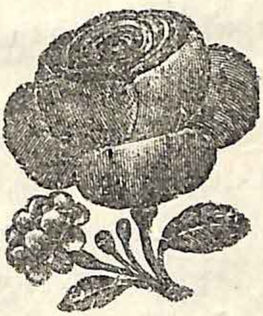
আশ্চর্য হয়ে নাবিকরা বলল, "তোমরা ক'জন?"

"তা ছেলেপুলে নিয়ে, পঁয়তাল্লিশ জনের কম নয়। সে যাই হোক। এখন শীত গেছে, আমরা আমাদের বরফে হাঁটার জুতো পরে সমুদ্রের ধারে যাব। সেখানে ছোট বন্দর আছে। আমাদের জাহাজ আছে। মেয়েরা, ছেলেপিলেরা বন্দরে থাকবে। পুরুষরা কাজে বেরোবে।"

"কি কাজ তোমাদের?" ওরা অবাক হয়ে গেল।

"কেন মাছ-ধরা ছাড়া আবার কাজ আছে নাকি? যাবে আমাদের সঙ্গে? আমাদের আরো লোক দরকার।"

এইভাবে এক দিন ঐ নাবিকরা আবার দেশে ফিরে গিয়ে, এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল।



হাতি আর দরজির গল্প

হাতির বিষয় যত গল্প শুনেছি তার মধ্যে দরজির গল্পটাকেই আমার সব চাইতে ভালো লাগে।

এক রাজার মোতি বলে চমৎকার এক হাতি ছিল। যেমনি তার বুদ্ধি, তেমনি তার খোস-মেজাজ। সবাই তাকে ভালোবাসত।

শহরের ধার দিয়ে কুলকুল করে সুন্দর এক নদী বয়ে যেত। সেই নদীতে দাউদ বলে মাহুত রোজ মোতিকে স্নান করাতে নিয়ে যেত। হাঁটু জলে নেমে, শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়ে, মহা আনন্দে মোতি স্নান করত। তারপর আবার ঐ একই পথে রাজবাড়ির হাতিশালে তারা ফিরে যেত।

পথটি রাজবাড়ির সিংহ-দরজা থেকে একেবারে নদীর তীর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। মাঝখানে শহরের বড় লোকদের বাড়ি, বাগান, তারপর বাজার হয়ে তবে নদীতে পৌঁছতে হত।

ঐ বাজারে একটা দরজির দোকান ছিল। দরজির সঙ্গে দাউদের বড় ভাব। রোজ ঐখান দিয়ে যাবার সময়, দাউদ মোতিকে থামতে বলে, তার ঘাড়ের ওপর বসে বসেই দরজির সঙ্গে গল্প করত। দরজি মোতিকেও খুব ভালোবাসত। মোতি মিষ্টি খেতে ভালোবাসে শুনে রোজ তার জন্যে দরজি কিছু না কিছু রেখে দিত। মোতি এসে দাঁড়িয়েই মিষ্টির আশায় শুঁড় বাড়িয়ে দিত। আর দরজি অমনি তাকে হয় একটা মিষ্টি ফল, নয় একটা লাড্ডু, কি বরফি, কি বাতাসা দিত। সেটাকে মুখে ফেলে, চোখ বুজে মোতি তারিয়ে তারিয়ে খেত। তারপর দাউদের গল্প করা শেষ হলে, ওরা আবার নদীর দিকে চলত।

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি, দরজির কাছে একটাও ফল, কি



মিষ্টি, কি খাবার ছিল না, যা মোতিকে দেওয়া যায়। দরজির কেমন দুষ্টু বুদ্ধি জাগল। যেই না মোতি শুঁড় বাড়িয়ে দিয়েছে, অমনি দরজি তার হাতের ছুঁচটি শুঁড়ের ডগায় ফুটিয়ে দিয়েছে। শুঁড়ের ডগাটি মানুষের ঠোঁটের মতো নরম। মোতির তাই খুব ব্যথা লাগল। তবু সে শুঁড়টি সরিয়ে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর দাউদের গল্প শেষ হলে দু-জনে রোজকার মতো নদীতে গেল। খুব জল ছিটিয়ে স্নান করল মোতি সেদিন। দাউদের মনে একটু ভাবনা ছিল, দরজি কাজটা ভালো করেনি। কি জানি, হাতির মেজাজ যদি বিগড়ে যায়। তাই জলে নেমে মোতির ফূর্তি করে স্নান করা দেখে দাউদও নিশ্চিন্ত হল।

এবার ফেরার পালা। অন্যদিন ফেরার পথে আর কোথাও থামা হয় না। ওরা সোজা বাড়ি ফেরে। আজ দরজির দোকানের সামনে পৌঁছে মোতি নিজের থেকেই থামল। দাউদ ভাবল কি ব্যাপার। এমন সময় শুঁড় তুলে এক শুঁড় ভরতি কাদা-জল মোতি দরজির গায়ে মাথায়, তার হাতের সাদা রেশমী কাপড়ের ওপর পিচ্‌কিরির মতো ছিটিয়ে দিয়ে ধীরে-সুস্থে আবার পথ ধরল।

হাতের সেলাই নষ্ট হল বলে দরজি হায়-হায় করতে লাগল, দাউদকে আর তার হাতিকে গালি দিতে লাগল।

তখন সামনের দোকানের পান-ওয়ালা বলল, ঠিক হয়েছে, যেমন কর্ম তেমনি ফল। তুমি ভেবেছিলে বোবা জানোয়ার অন্যায় বোঝে না। তাই বেচারির শুঁড়ে ছুঁচ ফোটালে। হাতি যেমন তেমন জানোয়ার নয়। ওরা সব বোঝে, সব মনে রাখে। অন্যায় করলে ওরা সাজা না দিয়ে ছাড়ে না। ভালো চাও তো কাল ওর জন্য একটা ভাল খোবানি রেখো।"

তাই রেখেছিল দরজি। মোতির সঙ্গে আবার তার ভাব হয়ে গেছিল।

চা বাগানের হাতি

হাতির গল্প আর কত বলব! দেখতে যাই হোক না কেন, বুদ্ধিতে প্রায় মানুষেরি সমান। আর সত্যি কথা বলতে কি, দেখতেও বড় সুন্দর।

ভারি রসবোধ হাতির; মজার ব্যাপার ভারি উপভোগ করে। আমার বাবার কাছে গল্প শুনেছি, ওঁদের জরীপ পার্টি ১২ নং একটা মা-মরা হাতির বাচ্চা পুষেছিল।

তাকে ক্যাম্পসুদ্ধ সব্বাই ভালোবাসত আর সে ব্যাটাও সেটা জানত। করত কি, একটা ঘন ঝোপের পিছনে লুকিয়ে থাকত আর একলা কেউ সেখান দিয়ে গেলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে তাকে পিছন থেকে ঢুঁ মেরে ফেলে দিত।

সে তো ঘাবড়ে গিয়ে মহা চেল্লা-চিল্লি লাগিয়ে দিত আর হাতির বাচ্চা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখত। তার চোখ চক্‌চক্ করত আর ঠোঁট দেখেই বোঝা যেত বেজায় হাসি পাচ্ছে!

শুধু মজার ব্যাপারেই নয়, হাতির বুদ্ধি বোঝা যায় তার বিচারবোধেও।

কিছুদিন আগে কাগজে একটা অদ্ভুত ঘটনা পড়েছিলাম।

হিমালয়ের পায়ের কাছে, তরাইয়ের জঙ্গলে, দশ পনেরো মাইল দূরে দূরে তিনটি চা বাগান আছে। জানই তো ওরা পনেরো মাইল

দূরকে পাশের বাড়ীই মনে করে। এর-ওর বাড়ি খাওয়া, এক সঙ্গে ক্লাবে যাওয়া, এসবে ওদের কোন অসুবিধাই হয় না।

বাগানের সামনে দিয়ে তরাইয়ের বড় রাস্তা চলে গেছে।

উঁচু-নিচু জায়গাতে চায়ের ক্ষেত, কোথাও পাহাড়ের গা কেটে ধাপে ধাপে চা-গাছ পোঁতা হয়েছে। দিনের বেলায় সেখানে লোকজন কাজে ব্যস্ত থাকে। রাত হবার আগে লোকেরা যে যার কোয়ার্টারে চলে যায়। চারদিক চুপচাপ হয়ে যায়। কয়েকজন বন্দুকধারী পাহারা-ওয়ালা হয়তো থাকতে পারে। এত কাছে ঘন বন, সেখান থেকে বুনো জানোয়ার চলে আসা কিছুই অসম্ভব নয়।

আসেও মাঝে মাঝে, তবে কারো ক্ষতি না করলে কেউ কিছু বলে না।

বড় সুন্দর ও-সব জায়গা, চারিদিকে থাকে থাকে চা-গাছ, বাড়ি-ঘরের চারদিকে ফুল ফলের বাগান। পাহাড়ের নিচের জায়গা, জল পায় ঢের। আগে খুব ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের ভয় ছিল, আজকাল সে সবও প্রায় নেই বললেই হয়। বেশ শান্তিতেই থাকে ওরা।

এমন সময় একদিন মধ্যিখানের চা-বাগানের মালিক ক্লাব থেকে ফিরে এসে শুনলেন সর্বনাশ হয়েছে! একদল বুনো হাতি এসে ফলের গাছ জখম করে চা গাছ উপড়ে, লোকদের কোয়ার্টার মাড়িয়ে ভেঙে, চারদিকে তচ্‌নচ্‌ করে দিয়ে চলে গেছে।

মালিক তো অবাক! বুনো হাতির দেশ সেটা, বুনো হাতির দল অনেক সময়ই ভালো সবুজ গাছপালার খোঁজে চা-বাগানের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করে। কই কখনো তো কিছু বলে না।

আজকেই দেখা যাচ্ছে সব অন্য রকম। তখুনি অন্য দুই চা-বাগানে খোঁজ নেওয়া হল। তারা খবর শুনে তো অবাক! হাতিরা তাদের সামনে দিয়েও চলে গেছে, অনেকেই দেখেছে। থামেওনি, কিছু বলেওনি, ক্ষেপেছে বলেও মনে হয়নি।



সে রাতটা কোনো রকমে কাটল। আলো নিয়ে, বন্দুক নিয়ে পাহারা বসে রইল। কেউ এল না।

পরদিন সকালে এই নিয়ে অনেক কথা হল। খিদে পেলে হাতির পাল অনেক সময় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষেতে ঢুকে ফসল নষ্ট করে। কিছু বললে বাড়ি-ঘর ভাঙে, লোকও মারতে পারে। সে শুধু খিদের তাড়নায়, বনের খাবার ফুরিয়ে গেলে। এবার তো খায়ওনি কিছু, শুধু ভেঙেচুরে দিয়ে গেছে।

তাছাড়া খিদেই যদি পাবে, তাহলে আগের বাগানটি ও পরের বাগানটি ছেড়ে, মধ্যিখানের বাগানে হামলা কেন?

চা-বাগানের বুড়ো সর্দার বলল—

'না সাহেব, এর অন্য কারণ আছে। কেউ ওদের ক্ষতি করেছে। সাজা দেবার জন্য এ রকম করে গেছে। মানুষের চেয়ে কিছু কম চালাক নয় ওরা!'

তখন চা-বাগানের সব লোকদের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল যে সেদিন ভোরে হাতির পাল যখন বাগানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, কয়েকটা মা-হাতি আর বাচ্চা হাতি খানিকটা পেছিয়ে পড়েছিল।

বাচ্চাগুলো মজা করে ছুটোছুটি করছিল, পথের ধার থেকে ফলটা পাতাটা ছিঁড়ে খাচ্ছিল। একেবারে বাগানের বেড়া ঘেঁষে কয়েকটা কলা গাছ, তাতে এই বড় কলার কাঁদি পড়েছে। তাই দেখে বাচ্চা-গুলোকে পায় কে! অমনি দৌড়ে এসে কাঁদি ধরে টানাটানি লাগিয়ে দিয়েছে।

যাদের কলাগাছ তারা ওদের তাড়াবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কে কার কথা শোনে?

তখন আধ-বুড়ি এক বৌ রাঁধতে রাঁধতে বেরিয়ে এসে, দিয়েছে সবার আগের বাচ্চাটার শুঁড়ের ডগায় ছ্যাঁকা!!

সঙ্গে সঙ্গে ফিঁ—ফিঁ শব্দ করতে করতে, ল্যাজ তুলে বাচ্চাগুলোর সে কি দৌড়! মা-হাতিরা কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল, এবার তারা বাচ্চাদের নিয়ে আবার পথ ধরল।

এই তো ব্যাপার।

বৌ কেঁদে পড়ে বলল,

'আমার জন্যেই সব হয়েছে। কিন্তু দুষ্টু ছেলেকে শাসন করব না, বলুন সাহেব?'

মালিক শুধু বললেন,

'হাতির নিয়ম আর মানুষের নিয়ম কি এক, মা?'



হ্যানিবলের হাতি

হাতির গল্প বলতে হলে হাজার দুই বছর আগে থীব্‌সের বীর যোদ্ধা হ্যানিবলের কথাও বলতে হয়। ইনি এক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, তাই নিয়ে এই গল্প। সে সময় পৃথিবীর নানা জায়গায় রোমানরা রাজ্য বিস্তার করেছিল। তাদের অনেক শত্রুও ছিল। হ্যানিবলের বাবা তাদের একজন। এঁরাও আসলে রোমের লোক, তবে দেশ থেকে নির্বাসিত।

হ্যানিবলের বাবা তাঁকে ছোটবেলা থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতেন। রোমের ওপর তাঁর ভারি রাগ ছিল। ছেলেকে বারবার বলতেন যেন রোমের সঙ্গে কখনো বন্ধুত্ব না করে।

বাবা মারা গেলে পর হ্যানিবল সেনাপতি হলেন। সৈন্য নিয়ে তিনি তখন স্পেন দেশে ছিলেন। কেবলি ভাবতেন কেমন করে রোমকে যুদ্ধে হারানো যায়। যুদ্ধের জাহাজ নিয়ে, ভূমধ্য সাগরের ওপর দিয়ে গিয়ে রোমকে আক্রমণ করে জিততে পারবেনা না। রোমানরা বড় শক্তিশালী। সমুদ্রের দিকটা রক্ষা করবার বড় ভালো ব্যবস্থা।

তখন হ্যানিবলের মাথায় এক বুদ্ধি এল। বুদ্ধিটা অবিশ্যি খুব ভালো ছিল না। তিনি ভাবলেন যদি ডাঙার ওপর দিয়ে গিয়ে, আল্প্‌স্ পাহাড় পার হয়ে, উত্তর দিক থেকে রোমকে আক্রমণ করা যায়, তাহলে তো খুব সুবিধা হয়। পাহাড়ের চূড়ো বরফে'ঢাকা থাকে। তার ওপর দিয়ে যে কোনো শত্রু অসিতে পারে, এ-কথা রোমানদের কখনোই মনে হবে না। ওদিকে তারা নিশ্চয়ই বেশি সৈন্য রাখবে না। তাহলে রোম জয় করা খুব শক্ত হবে না।



যেমন ভাবা তেমনি কাজ। অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়-সোয়ার, পদাতিক সৈন্য, সব তৈরি ছিল হ্যানিবলের। আর নিলেন ৭২টি হাতি। ইউরোপের লোকরা হাতি না দেখলেও আফ্রিকাতে ঢের হাতি দেখা যেত। এ-সব হাতি সেখান থেকে আনা। পথে তাদের খাবার-দাবার যোগাড় করাই যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল তা সহজেই বোঝা যায়।

সে যাই হক, হাতি-ঘোড়া লোক-জন নিয়ে হ্যানিবল আল্প্‌স্‌ পাহাড়ে চড়তে লাগলেন। হাতিদের সে কষ্টের কথা ভাবা যায় না। তাদের পায়ের চাপে চাংড়া চাংড়া বরফ ভেঙে পড়াতে কত হাতি যে নিচে পড়ে মরল তার ঠিক নেই। তার ওপর গরম দেশের জানোয়ার ঐ বরফ-জমা শীত সইতে পারবে কেন!

যখন চূড়ো পার হয়ে হাতি নিয়ে হ্যানিবল ইটালির নিচু জমির দিকে নামতে লাগলেন, তখন এক কাণ্ড হল। ওদিকে যত রোমান সান্ত্রী ছিল, তারা নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ঘোড়-সোয়ার পদাতিকের সঙ্গে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ওগুলো আবার কি, জ্যান্ত জানোয়ারের মতো নড়ে চড়ে? এ নিশ্চয় ভৌতিক ব্যাপার!

আর কি তারা ওখানে দাঁড়ায়। জায়গা ফেলে যে যেদিকে পারল প্রাণ নিয়ে পালাল। তার ফলে হ্যানিবল রোমের খুব কাছে এগিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু ক্লান্ত সৈনিক নিয়ে আর কতদিন যুদ্ধ করবেন? শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেন আর নিজের প্রাণটি দিলেন।

সব চাইতে মজার কথা হল যে বাহাত্তরটি হাতির মধ্যে মাত্র গোটা এগারো পাহাড় পার হতে পেরেছিল। তাদের দেখেই ওখানকার লোকদের পিলে চমকে গেছিল। গ্রামের লোক লেখাপড়াও শেখেনি, হাতির নাম-ও কখনো শোনেনি। হ্যানিবল করে মরে গেছেন, রোমানদের ক্ষমতাও কবে নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু লোকে আজ অবধি হ্যানিবলের হাতির গল্প করে।

—০—